নবীদের দু'আ

“ (নবী ও রাসূলদের করা কুর'আনে
বর্ণিত দু'আসমূহের প্রেক্ষাপট, মর্ম
ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ) ”

ইব্রাহিমের (আ.) কথা স্মরণ করুন, তিনি বলেছেন, 'যে আমাকে অনুসরণ করে, সে আমার পরিবারের অংশ হয়ে যায়।' নবীদের পরিবার রক্তের সম্পর্ক দ্বারা গঠিত হয় না, বরং তাদের পরিবার ঈমানের দ্বারা গঠিত হয়। আমরা সকলেই নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সাথে যুক্ত। কারণ, এই স্বীকৃতি দিই যে, তিনি (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। আমরা আবু তালিব ও তাঁর পরিবারের কিছু সদস্য, যাদের সাথে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর রক্তের সম্পর্ক রয়েছে, তাদের থেকেও আমরা আমাদের নবী (ﷺ)-এর সাথে বেশি সম্পর্কিত, যেহেতু তারা ঈমান আনেনি এবং আমরা ঈমান এনেছি।

নবীদের দু'আ

(নবী ও রাসূলদের করা কুর'আনে
বর্ণিত দু'আসমূহের প্রেক্ষাপট, মর্ম ও
তাৎপর্য বিশ্লেষণ)

মূল: **উস্তাদ নোমান আলী খান**

অনুবাদ: **শাফাআত আলী ও ইমদাদ খান**

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা

উস্তাদ নোমান আলী খান বর্তমান সময়ের একজন জনপ্রিয় ইসলামি বক্তা ও দায়ী। তাঁর সম্পর্কে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। ইন্টারনেটের বদৌলতে আমরা সকলেই কম বেশি তাঁকে জানি।

১৯৭৮ সালে পাকিস্তানে জন্ম নেওয়া এই ইসলামি ব্যক্তিত্ব কুর'আনের শৈল্পিক মাহাত্ম্য সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য বিশেষভাবে নন্দিত। বর্তমানে তিনি *Bayyinah Institute*-এর মাধ্যমে মুসলিমদের মাঝে আরবি ভাষার জ্ঞান বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

আমাদের আলোচ্য বইটি উস্তাদ নোমান আলী খানের নির্বাচিত কিছু ভাষণ বা লেকচারের অনুবাদ।

নবী ও রাসূলদের করা কুর'আনে উল্লিখিত বিভিন্ন দু'আর প্রেক্ষাপট ও গূঢ় তাৎপর্য এই বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে, যা সত্যই চমকপ্রদ। বইটির বিষয়বস্তু কুর'আনের মর্ম উপলব্ধিতে সহায়ক বলে 'মুসলিম ভিলেজ' প্রকাশনী থেকে বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি এবং বইটির মুদ্রণে কোনো ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে পাঠকগণকে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

আমিন।

- মুহাম্মদ মামুন বেপারী

নবী আদমের (আ.) দু'আ

আদম (আ.) ও হাওয়ার (আ.) ঘটনা

আমাদের আদি পিতামাতা আদম (আ.) এবং হাওয়া (আ.) জান্নাতে সুখেই বাস করছিলেন। ওই জান্নাত কোথায় ছিল, তার সঠিক অবস্থান কুর'আন বর্ণনা করেনি। তবে কুর'আনের ভাষ্যকাররা এ ব্যাপারে একমত, তা পৃথিবীর কোথাও ছিল না। মূল বিষয় হচ্ছে জান্নাতটির সঠিক অবস্থান জানার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই, বরং সেখানে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তা থেকে শিক্ষা নেয়ার মাঝেই সত্যিকারের কল্যাণ রয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আদম (আ.)-কে বেহেশতে কেন তাদের উপর বিপদ নেমে আসতে পারে, সে ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا

حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

'হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাকো এবং ওখানে যা ইচ্ছে তা আহার কর।' [*আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে থাকতে মাত্র একটি শর্ত জুড়ে দেন*] কিন্তু এ গাছের কাছে যেও না। অন্যথায় তোমরা জালিম গণ্য হবে।'

- সূরা বাকারাহ, ২:৩৫

আমাদের পিতা আদম (আ.) ও মাতা হাওয়ার (আ.) করা দু'আকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হলে, আমাদেরকে প্রথমে এটা উপলব্ধি করতে হবে, কিভাবে তাদের পদস্খলন ঘটলো এবং নিষিদ্ধ গাছ থেকে ফল খাওয়ার মাধ্যমে তারা আল্লাহর দেওয়া একটি মাত্র আদেশ অমান্য করে ভুলে জড়ালো।

পদস্খলন তখনই ঘটে, যখন আগামীদিনে কি ঘটতে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে মানুষ সতর্ক থাকে না। অথচ এ অসতর্কতা মোটেও ইচ্ছাকৃত বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়। ভুলের ব্যাপারে মানুষ এমনটাই ভাবে। তাই মানুষকে অবশ্যই সব সময় সতর্ক থাকতে হবে এবং কিভাবে শয়তানের ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছে, তা খেয়ালে রাখতে হবে। মানুষকে অবশ্যই এটা মেনে নিতে হবে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য বানাতে শয়তার সব ধরনের কলা-কৌশল প্রয়োগ করবে।

আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা কুর'আনে উল্লেখ করেন:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ

'বলুন, হে কিতাবের অনুসারীরা তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে অযথা বাড়াবাড়ি করো না। যারা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে বিভ্রান্ত করেছে এবং সরল পথ যারা হারিয়েছে, তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।' - সূরা মায়িদাহ, ৫:৭৭

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّـهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا

'যারা কাফের এবং আল্লাহর পথে বাধা
দেয়, তারা মারাত্মক পথভ্রষ্ট।'

- সূরা নিসা, ৪:১৬৭

শয়তানের কৌশল

এই ঘটনা থেকে আল্লাহ আমাদের শেখাতে চাচ্ছেন, আমাদের আদি পিতামাতা মানুষের অস্তিত্বের বহু আগেই শয়তানের প্রতারণার শিকার হয়েছেন। শয়তানের কৌশল হচ্ছে, সে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করে না, বরং ধীরে ধীরে আল্লাহর আনুগত্য করার যে সহজাত প্রবৃদ্ধি আমাদের রয়েছে, সেটাকে নিস্তেজ করতে থাকে, যতক্ষণ না আপনি ওই ভুল বা পাপ কাজে এতটাই আসক্ত হয়ে পড়েন যে, সেটাকে আপনি আর পাপ বা ভুল মনে না করে স্বাভাবিক বিষয় ভাবেন।

প্রথম ধাপ

- নিষিদ্ধ এলাকার সীমানার কাছাকাছি হাঁটাচলা করা

দ্বিতীয় ধাপ

- আপনি ওই পথে চলতে অভ্যস্ত হতে শুরু করেন

তৃতীয় ধাপ

- অবশেষে নিষিদ্ধ অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং পাপ বা ভুল করতে শুরু করেন
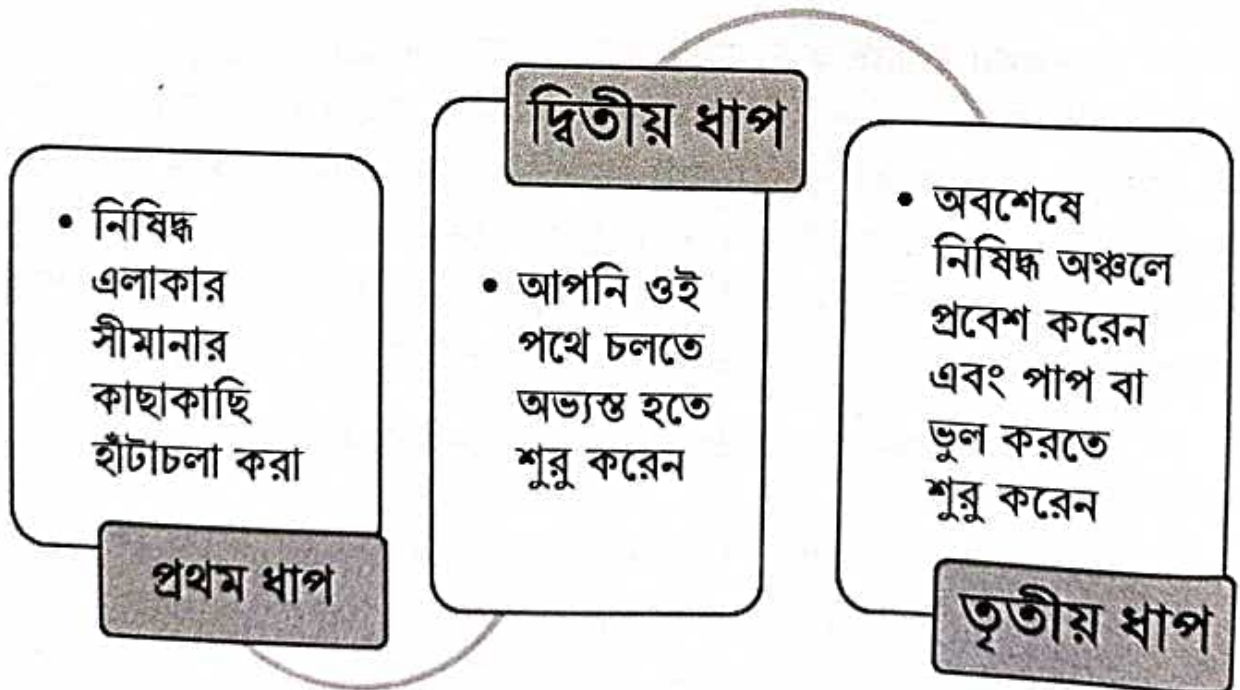
নিষিদ্ধ বৃক্ষ

আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা নতুন দম্পতিকে উদ্দেশ্য করে দ্বিতীয় সতর্কবার্তা জারি করেন, যেন তারা ইবলিসের উপস্থিতি ও তার শত্রুতা সম্পর্কে জানতে পারে। এই সতর্কবার্তাটি বেশ স্পষ্ট ও সরাসরি:

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَـٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾

'অতপর আমি বললাম, হে আদম, এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং তোমাদেরকে জান্নাত থেকে সে যেন বের করে না দেয়। তাহলে তোমরা দুর্ভাগা হবে। সেখানে সব আছে, না থাকবে ক্ষুধার্ত, না থাকবে উলঙ্গ এবং তোমরা তৃষ্ণার্তও হবে না এবং রৌদ্রেও কষ্ট পাবে না।' - সূরা ত্বোয়াহা, ২০: ১১৭-১১৯

বিতাড়িত ইবলিশ পরিকল্পনা তৈরি করে, যা ছিল সাধারণ এক কৌশল। ইবলিশ লক্ষ্য করলো, আদমের (আ.) মনের ভেতরটা ফাঁকা, তাই সে এই দুর্বলতার ফায়দা লুটার অপেক্ষায় থাকে। সে ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছে, আদম (আ.)-কে খুব সহজেই আয়ত্তে এনে ধ্বংস করা যাবে। ইবলিশ যে মেধাকে আগে ইবাদাতের কাজে ব্যবহার করতো, সেটাকে সে এখন নতুন শত্রুকে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করছে।

পাপাচারী ইবলিশ নির্দোষ দম্পতির নিকট কৌশল ও প্রতারণার বাহানা নিয়ে হাজির হয়:

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ

'অতপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল, হে আদম, আমি কি তোমাকে চিরস্থায়ী বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজ্যের কথা বলে দিবো?' - সূরা ত্বোয়াহা, ২০:১২০

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾
وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾

সে বলল: তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি, কেবল এ কারণ ছাড়া যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী।

সে তাদের কাছে (আল্লাহর) কসম খেয়ে বললো, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।' - সূরা আরাফ, ৭: ২০-২১

শয়তানের মন্দ পরামর্শ ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) কান দিলেন এবং নিষিদ্ধ বৃক্ষ ও তাদের শত্রু ইবলিস সম্পর্কে আল্লাহর স্পষ্ট সতর্কতা ভুলে যান। পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ হৃদয় ও মন্দ অভিপ্রায়হীন চেতনার অধিকারী আদম ও হাওয়া ইবলিশের অন্তরের ভয়াবহ ধরনের হিংসা ও শত্রুতার ব্যাপারে সন্দেহ করা পর্যন্ত ভুলে যায়।

ইবলিস সুকৌশলে তার আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে, যতক্ষণ না তারা তার ফাঁদে পা দিচ্ছে। ভুলে যাওয়া ও গাফেল থাকার কারণে তারা প্রতারণার শিকার হয় এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করার মতো পদস্খলনে জড়িয়ে পড়ে:

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

'আমরা ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতপর সে ভুলে যায় এবং আমি তাঁর মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি।'

- সূরা ত্বোয়াহা, ২০: ১১৫

আর এর মাধ্যমেই চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটে:

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ

'আদম তাঁর পালনকর্তার অবাধ্য হলো এবং
এতে সে পথচ্যুত হয়ে গেলো।'

- সূরা ত্বোয়াহা, ২০: ১২১

أَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ

অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে
পদস্খলিত করেছিল। পরে তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে
ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল।'

- সূরা বাকারাহ, ২: ৩৬

ভুল- উপলব্ধি- অনুশোচনা

আল্লাহ তা'আলা তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের পিতামাতাকে তাদের ভুল উপলব্ধি করতে সহায়তা করেন। আমাদের এই দুনিয়ার মতো নয়, যেখানে আমরা ভুল করলে বুঝতেও পারি না যে, আমরা কি করেছি। অন্য কারো কর্তৃক আমাদের বিবেককে ধাক্কা দেওয়া কিংবা পুরোপুরি মুখ থুবড়ে না পড়া পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারি না যে, আমরা ভুল করেছি। কিন্তু আল্লাহ আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-কে সাথে সাথে ভুল ধরিয়ে দিলেন এজন্য যে, এখান থেকে পরবর্তী আদম সন্তানগণ শিক্ষা লাভ করবে।

শয়তানের পরিকল্পনা মোতাবেক যখন তারা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে, তখন '*তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে পড়লো আর তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে তা ঢাকতে লাগলো।*' - সূরা আরাফ, ৭:২২

আমাদের গোপনাঙ্গসমূহ ঢেকে দেওয়ার এ সর্বজনীন অভ্যাসের উৎপত্তি এখান থেকেই হয়েছিল এবং এটা নির্দেশ করে যে, শালীনতা ও লজ্জাবোধ মানুষের সহজাত একটি প্রবৃত্তি, যা আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন।

যখন আমরা কোনো ভুল করি, তখন সাথে সাথে ঘণ্টাধ্বনি বাজতে শুরু করে না কিংবা আল্লাহ আমাদেরকে সোজা করে দেন না। আমরা বুঝতে পারি না আমরা কোনো ভুল করছি কিনা, পরবর্তীতে যখন বুঝতে পারি যে, আমরা ভুল করে ফেলেছি, তখন হয়তো অনেক দেরী হয়ে যায় কিংবা আমরা (ওই পাপ বা ভুলের পথে) অনেক দূর এগিয়ে যাই।

আল্লাহ আমাদের পিতামাতার সাথে কথা বলতে শুরু করেন, 'তাদের রব তাদেরকে বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং আমি কি তোমাদের বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?।' - সূরা আরাফ, ৭:২২। আল্লাহ তাদের জন্য কেবল একটি বৃক্ষকে হারাম করেছিলেন এবং বাদ-বাকি জান্নাতকে তাদের উপভোগের জন্য রাখেন।

অন্যভাবে বললে, শয়তান আমাদেরকে বহু হালাল জিনিসের মধ্য দিয়ে এমন এক হারাম জিনিসের দিকে নিয়ে যাবে, যেটা আমাদেরকে আল্লাহর অবাধ্য বানাবে এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুত করবে। আল্লাহ আমাদের জন্য অনেক হালাল রাস্তা খুলে দিয়েছেন, কিন্তু শয়তান চায় যে, আমরা হালাল রাস্তা বাদ দিয়ে হারাম রাস্তায় বিচরণ করি। শয়তান হালাল সম্ভাবনাগুলোকে উপেক্ষা করতে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে, যেন আমরা হারামে লিপ্ত হই।

শয়তান ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য

ইবলিশ (শয়তান)	আদম (মানুষ)
আল্লাহ আদমকে সিজদা করতে আদেশ করেন	আল্লাহ নিষিদ্ধ বৃক্ষ থেকে দূরে থাকার আদেশ দেন
শয়তানের ভুল: সে আদমকে সিজদা করেনি	আদমের ভুল: তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষ থেকে ফল খান
অহংকার: সে নিজের ভুল স্বীকার করেনি উল্টো অজুহাত দেখাতে শুরু করে	তিনি নিজের ভুল স্বীকার করেন এবং ক্ষমা চান
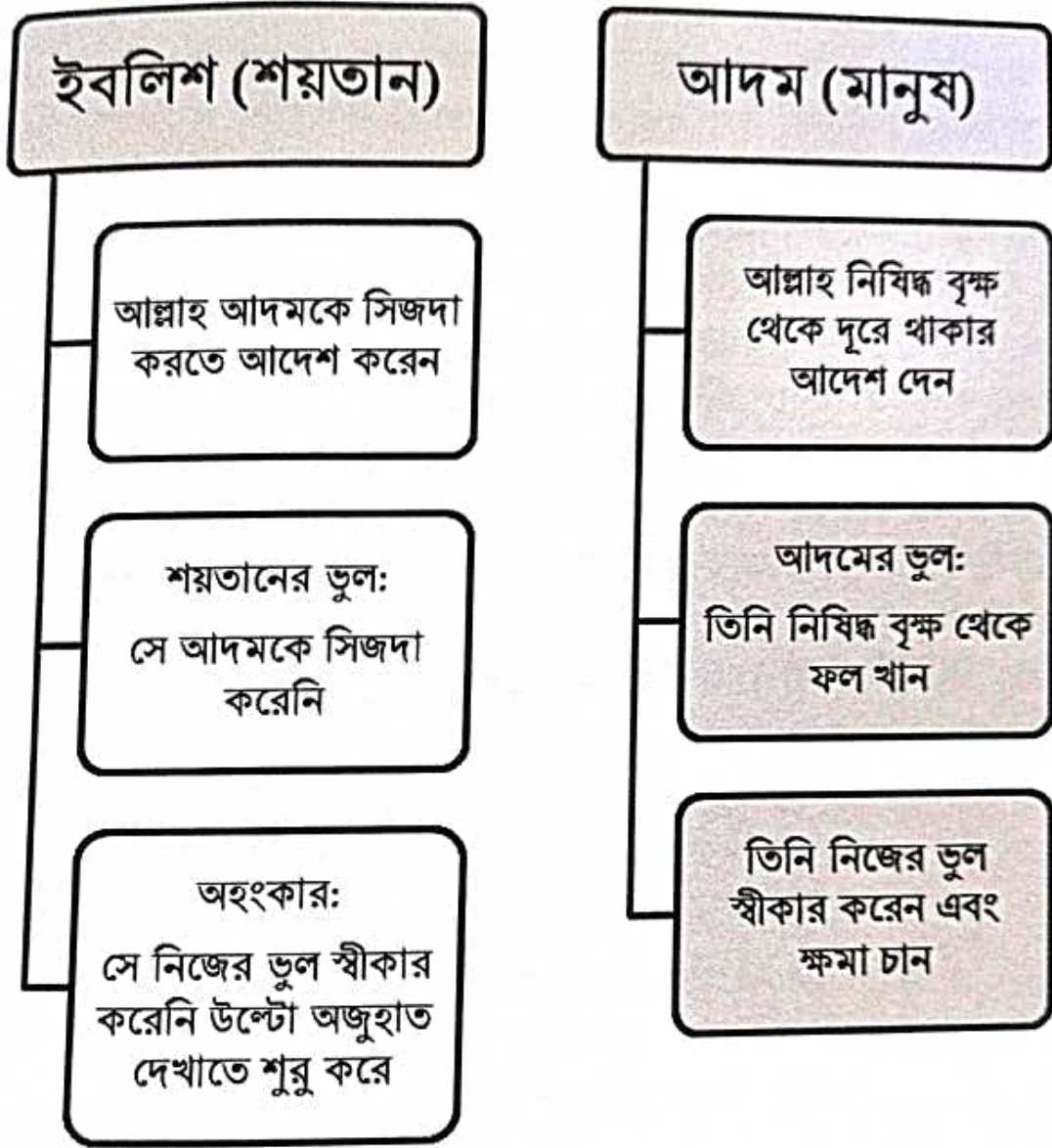
শিক্ষা

নিজেদেরকে শয়তানের কৌশল থেকে নিরাপদ রাখার জন্য কুর'আনের এই আয়াতগুলো জানা আমাদের জন্য আবশ্যক, যেন আমরা জানতে পারি যে, আমরা কোথায় যাচ্ছি। ভুল করা যদিও আল্লাহর অবাধ্যতা নয়, তথাপি এটা আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার মতো। আপনি আল্লাহকে অমান্য করার পদক্ষেপ নিচ্ছেন কিনা তা আপনি ছাড়া আর কে ভালো জানবে। যখন আপনি পাপের পথের কাছাকাছি আসতে থাকেন, তখন তা আপনাকে আরও বেশি শক্তি দিয়ে কাছে টানতে শুরু করে, যা মানুষ হিসেবে আমাদের জন্য বড় এক চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জটি কঠিন হলেও তা জয় করা অসম্ভব নয়, এমনকি কুর'আন ও আল্লাহর রজ্জু শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে আমরা পুরো বিষয়টি অর্থাৎ পাপের যে শক্ত আকর্ষণ ক্ষমতা রয়েছে, সেটাকে পাল্টে দিয়ে সেখানে আমরা পুণ্য ও নেকা কাজ করার প্রতি তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারি।

আদম (আ.) ও হাওয়ার (আ.) দু'আ

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'তারা বললো, 'হে আমাদের রব, আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।'

- সূরা আরাফ, ৭: ২৩

ইবলিস ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল এবং এর পরিণতি সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিল। অন্যদিকে আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) সাধারণ ভুলে যাওয়া ও গাফেলতির কবলে পড়ে এই ভুল করেন এবং পরবর্তীতে এর জন্য চরমভাবে দুঃখিত হন, বিনীতভাবে অনুশোচনা করেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। জান্নাতে থাকাকালে তারা এই দু'আ করেন এবং ওখানে থাকতেই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।

আমাদের প্রথম পিতামাতার এ ভুল তাদের জন্য এবং আমাদের সবার জন্য গুরুতর ফলাফল বয়ে আনলেও তার জন্য কোনো মন্তব্যের প্রয়োজন নেই। এটা তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত ভুল ছিল, এর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আলাদাভাবে ক্ষমাও করে দিয়েছিলেন। ইসলামী শিক্ষার মৌলিক একটি বিষয় হচ্ছে: প্রত্যেকেই নিজ কাজের জন্য দায়ী হবে এবং একজন আরেকজনের বোঝা বহন করবে না। এ বিষয়টি কুর'আনে বেশ কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

'যে যা করবে তাই পাবে। কেউ কারো
বোঝা বহন করবে না।'

\- সূরা আন'আম, ৬:১৬৪

আদম (আ.) ও হাওয়ার (আ.) প্রকৃত নিবাস ছিল জান্নাত। যদিও এটা ছেড়ে আসা এবং পৃথিবীতে বাস করা তাদের ভাগ্যে ছিল, তথাপি পৃথিবী তাদের জন্য ছিল এক অস্থায়ীভাবে আবাস, যেখান থেকে তারা পুনরায় তাদের মূল উৎসে ফিরে যাবেন। জান্নাতের স্বাদ আস্বাদন করানোর মাধ্যমে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তাদের হৃদয় ও রূহানি জগতের সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য সংযোগ সৃষ্টি করেন, যে জগত থেকে তারা দুনিয়াতে এসেছে এবং যা তাদের চিরস্থায়ী আবাস।

শিক্ষা

আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) তৎক্ষণাৎ তাদের কৃতকর্মের দায় নিজেদের কাঁধে তুলে নেন এবং তারা একে অন্যকে দোষারোপ করেননি, কোনো অজুহাতও দেখাননি। তারা তাদের ভুল স্বীকার করে নেন, কারণ তারা জানতেন, আল্লাহর অবাধ্যতার জন্য তারা দুজনই দায়ী ছিল। একে অন্যের দিকে আঙুল না তুলে তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেন। তারা আল্লাহর কাছে দু'আ করেন এবং সমবেত কণ্ঠে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, যা আমাদের পিতামাতা তরফ থেকে আমাদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

পরিবার হিসেবে আমাদের উচিত একসাথে দু'আ করা, একে অপরের জন্য ক্ষমা চাওয়া, ভুল করেছেন কি করেননি, সেটা বড় কথা নয়, একসাথে দাঁড়িয়ে আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি অর্জন করাটাই আসলে প্রকৃত ভালবাসা। এখান থেকে আমরা এটাও শিখেছি, যখন আমরা কোনো ভুল করি, তখন ভুল স্বীকার ও দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেওয়ার পরিবর্তে একে অপরের দিকে আঙ্গুল না তোলার খেলায় মেতে উঠি। এসব ক্ষেত্রে আমাদের জন্য আবশ্যক যে, আমরা আমাদের পিতামাতার স্থাপন করা আদর্শ অনুসরণ করা, নিজেদের ভুল স্বীকার করা এবং অজুহাত না দেখিয়ে সোজা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করা। আমরা হয়তো সব ধরনের যুক্তি উপস্থাপন করতে পারবো। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যখন আমরা সীমালঙ্ঘন করবো এবং আল্লাহর আইন অমান্য করবো, তখন অনুতাপ ছাড়া সব যুক্তিই অকেজো হওয়া উচিত।

পৃথিবীর দিকে যাত্রা

জীবনের যে চক্রটি দুনিয়াতে ঘটতে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) সম্যক অবগত আছেন এবং তারা পৃথিবীর জীবনের জন্য প্রস্তুত। এই পৃথিবীতে বাস করতে গেলে কি কি ঘটতে পারে, এটা ছিল তার একটি প্রিভিউ বা পূর্ব উপস্থাপনা। শয়তান তাদেরকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করে তাদেরকে পাপলিপ্ত করাতে চাইবে, কিন্তু যখনই তারা ভুল করবে বা বিপথগামী হবে, তখনই তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং সত্য পথে ফিরে আসবে:

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

'তিনি বললেন, 'তোমরা পরস্পর শত্রুরূপে নেমে যাও। তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে কিছু সময়ের জন্য বাসস্থান ও জীবিকা আছে।'

- সূরা আরাফ, ৭: ২৪

আল্লাহর আনুগত্য এবং শয়তানের প্রতি দুশমনি জান্নাতে ফেরার একমাত্র পথ

আল্লাহ আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-কে নানাভাবে প্রস্তুত করেন। তিনি তাদেরকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) ও পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করতে হয়, সেই অভিজ্ঞতা দান করেন। আদম (আ.)-কে তিনি সবকিছুর নাম শেখান এবং সেগুলোর বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা সম্পর্কে নির্দেশনা দেন। পৃথিবীর তত্ত্বাবধায়ক ও আল্লাহর নবী হিসেবে আদম (আ.) নিজের পদ গ্রহণ করেন। আল্লাহর প্রথম নবী হিসেবে নিজের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে কিভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে হয় এবং অপরাধ করলে কিভাবে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইতে হয়, তা শেখানোর দায়িত্ব তাঁর ছিল। আদম (আ.) পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরিবারের দায়িত্ব পালন করেন এবং কিভাবে পৃথিবীতে খাপ খাইয়ে নিতে হয় এবং তাঁর যত্ন নিতে হয়, তা শিখেন। তাঁর দায়িত্ব আবাদ করা, নির্মাণ করা ও জনবসতি গড়ে তোলা। তিনি আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেক সন্তানদের লালন-পালন করতে থাকেন এবং সেইসাথে পৃথিবীর যত্ন ও উন্নতি সাধন করতে থাকেন।

এভাবেই আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই সবুজ, সজীব গ্রহে তাদের থেকে যেসব মানুষ আসবে, তারা বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করবে এবং তারা দুনিয়াতে ভাল ও মন্দের লড়াইকে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত জারি রাখবে। এর উপরই তারা মারা যাবে। তাদের নশ্বর দেহসমূহ মাটিতে সমাহিত হবে এবং সেখান থেকেই তারা শেষ বিচারের দিনে পুনরুত্থিত হবে।

আমাদের প্রথম পিতামাতার উপর আল্লাহর রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

নবী নূহের (আ.) দু'আ

নবী নূহ (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়কে সত্য ও সরল পথে ফিরিয়ে আনতে প্রেরণ করা হয়। তাঁর সম্প্রদায় সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা গ্রহণ করেছিল। নূহ (আ.)-কে আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম নবীগণের একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি তাঁর জাতিকে দীর্ঘ ৯৫০ বছর ধরে তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। আমাদের মাঝে যারা ইসলামের বাণী অন্যের কাছে ছড়িয়ে দিতে গিয়ে অধৈর্য হয়ে পড়েন, নূহের (আ.) ঘটনাতে তাদের জন্য দুর্দান্ত এক উপদেশ রয়েছে। নূহ (আ.) তাঁর জাতির কাছে রিসালাতের বার্তা পৌঁছানোর যাবতীয় পন্থা ব্যবহারের পর যখন এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এ জাতি সত্যকে গ্রহণ করবে না, তখনই তাদের উপর আল্লাহর আজাব নেমে এসেছিল।

নূহের (আ.) ঘটনা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, তাঁর নাম কুর'আনে ৪২-বার এসেছে এবং মোট ১১৫-টি আয়াত তাঁর ও তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কিত। এছাড়াও কুর'আনের ২১-তম সূরার নাম তাঁর নামে রাখা হয়। বর্ণিত আছে যে, নূহ (আ.) তাঁর জীবনকালে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে যে পরিমাণ শারীরিক ও মৌখিক নির্যাতন সহ্য করেছিলেন, তা অন্য কোনো নবী করেননি।

সর্বকালের নিকৃষ্টতম জাতি হিসেবে আল্লাহ নূহের (আ.) জাতির কথা উল্লেখ করেন। তাদের কাছে রিসালাতের বার্তা শোনা ও গ্রহণের মাধ্যমে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার দীর্ঘতম সুযোগ ছিল, কিন্তু তারা তাতে কর্ণপাত করেনি। তারা চরম বিদ্রোহী ও ভীষণ পাপাচারী ছিল। আদমের (আ.) পরে আসা জাতির মাঝে তারাই ছিল প্রথম জাতি। হাদিসে বর্ণিত আছে, 'নূহের (আ.) সম্প্রদায়ের নেক লোকেরা মারা গেলে, শয়তান তাদের অন্তরে এ কুমন্ত্রণা দিতো যে তোমরা যেখানে বসে মজলিশ করো, সেখানে কতিপয় মূর্তি স্থাপন করো এবং ওইসব পুণ্যবান লোকের নামেই এগুলোর নামকরণ করো। কাজেই তারা তাই করতো। কিন্তু তখনও ওইসব মূর্তির পূজা করা হতো না। তবে মূর্তি স্থাপনকারী লোকগুলো মারা গেলে এবং মূর্তিগুলোর ব্যাপারে সত্যিকারের জ্ঞান বিলুপ্ত হলে লোকেরা সেগুলোর পূজা আরম্ভ করে দেয়।' (সহিহ বুখারি)

প্রাচীন তাফসিরবিদদের মতে নবী নূহের (আ.) মাহাত্ম্যের কারণগুলোর মাঝে কিছু কারণ নিম্নরূপ:

নূহ (আ.)

- দাদা ইদ্রিসের (আ.) পরে প্রেরিত প্রথম নবী
- ৯৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে দ্বীনের প্রচারকারী প্রথম ও একমাত্র নবী
- শিরকের বিরুদ্ধে জনগণকে সতর্ক করা প্রথম নবী
- প্রথম শরিয়াহ আইন নিয়ে আসা নবী
- নিজ জাতির দ্বারা নিগৃহীত প্রথম নবী
- প্রথম নবী, যার জাতিকে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা ঐশ্বরিক আজাব দিয়েছিলেন
- প্রথম নবী, যিনি তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের জন্য দু'আ করেছিলেন

নূহ (আ.) আপন সম্প্রদায় দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রত্যাখ্যাত হতে থাকেন এবং তাদের দ্বারা তিনি কঠোরভাবে নির্যাতিত হন; তথাপি তিনি হাল ছেড়ে দেননি। নূহ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মাঝে বিরোধ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। আল্লাহদ্রোহীরা তাদের অন্তর ও বাহ্যিক কর্ণকে একবারে বন্ধ করে দেয় এবং তারা নূহের (আ.) প্রচারিত তাওহিদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে। নবীর প্রতি বিদ্বেষ ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে সত্যকে মেনে নিতে বাধা দেয়, যদিও তাদের নিকট সত্য অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল।

তাদের এমন বিদ্বেষ ও শত্রুতার বিরুদ্ধে নূহের (আ.) পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা ছাড়া আর কোনো প্রতিরোধ ছিল না। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর নিয়ন্ত্রা। ধৈর্য সহকারে তিনি যাবতীয় অবমাননা সহ্য করতে থাকেন এবং প্রতিনিয়ত আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য ও আশ্রয় চাইতে থাকেন।

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ

'হে আমার রব! যারা আমাকে অস্বীকার করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।' - সূরা মুমিনূন, ২৩:২৬

দু'আর পাশাপাশি তাকে আল্লাহ তাকে যে মিশন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তিনি সে দায়িত্ব অত্যন্ত যত্ন ও ধৈর্যের সাথে চালিয়ে যেতে থাকেন।

নৌকা তৈরি

নূহের (আ.) সম্প্রদায়ের লোকেরা এতটা বিগড়ে গিয়েছিল যে, তিনি তাদের ব্যাপারে আশা ছেড়ে দেওয়া অথবা তাদের হেদায়তের জন্য দু'আ করা ছাড়া আর কোনো পথ রইলো না। হাদিস অনুসারে, প্রত্যেক নবী-রাসূল তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য দু'আ করার সুযোগ পেতেন, যা সর্বদা মঞ্জুর করা হতো। নূহ (আ.) ঠিক সেই দু'আটি তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের ধ্বংসের জন্য ব্যবহার করেন। এমনটি তিনি রাগ বা তাদের প্রতি বিদ্বেষ থেকে করেননি, বরং তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাদের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ এতদূর গড়িয়েছে যে, তাদের জন্য সংশোধনের সকল রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে।

আল্লাহ নূহের (আ.) দু'আ কবুল করেন। ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, যখন বৃষ্টি শুরু হয়, তখন বন্য প্রাণী, গৃহপালিত প্রাণী থেকে শুরু করে পাখিরা পর্যন্ত নূহের (আ.) কাছে আসে এবং তাঁর অধীনস্থ হয়। আল্লাহর আদেশ মোতাবেক তিনি প্রতিটি প্রজাতির একটি পুরুষ ও একটি নারীসহ একজোড়া করে নৌকায় তুলেন। নৌকার নিচের অংশটি ছিল প্রাণিদের জন্য, মাঝের অংশটি মানুষের জন্য এবং উপরের অংশটি পাখিদের জন্য।

মহাপ্লাবন

এরপর যা ঘটেছিল, তা অনুমান করা যেতে পারে। আশ্রয় নেওয়ার মতো কোনো জায়গা কোথাও নেই; পালানোর জন্য নেই অন্য কোনো নৌকা। নূহের (আ.) নৌকা ছাড়া সবই যেন মৃত্যুফাঁদ। প্লাবন শুরু হওয়ার সাথে সাথে নূহের (আ.) নৌকাটি ভেসে উঠল এবং আল্লাহর আদেশে তা পরিণত হলো মুমিনগণ ও তাদের নবীর জন্য এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এমন পরিস্থিতিতে কাফেরদের কি হয়েছিল? আমরা খুব সহজেই তাদের ভয় ও আতংকের অবস্থাটা কল্পনা করতে পারি। পানির উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে সবার মধ্য থেকে চিন্তা করার শক্তিটুকু গায়েব হতে থাকে এবং সকলে নিজেকে বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। অল্প বয়স্ক, দুর্বল ও বৃদ্ধরা ওই প্লাবনে ডুবে যায়। যারা সবল ও শক্তিশালী ছিল, তারা নিকটবর্তী উঁচু পাহাড়ে আশ্রয় নিতে ছুটে যায়।

আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রী ছাড়া পরিবারের অন্য সদস্যদেরকে সুরক্ষিত রাখা হবে। কিন্তু নূহের (আ.) এক পুত্র নৌকাতে উঠেনি এবং সে কাফেরদের সাথে থাকাকেই পছন্দ করেছিল। নিজ পুত্রের জীবন রক্ষার তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। তিনি নিজের সন্তানকে চোখের সামনে ডুবে যেতে দেখে অস্থির হয়ে পড়েন। এমন বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে তিনি আকুল হয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করেন:

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ
وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ

নূহ (আ.) তাঁর রবকে বললেন, 'হে রব! আমার পুত্র তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত; আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য এবং আপনিই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বিচারক।' - সূরা হুদ, ১১:৪৫

বিশ্লেষণ: 'হে আমার প্রভু, অবশ্যই আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য। আপনি আমার পরিবারকে উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি আপনার সিদ্ধান্তকে বিশ্বাস করি এবং আমি আপনার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ পোষণ করি না, তবে আমি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। সে আমার পুত্র এবং পুত্র তো পরিবারের একটি অংশ, আর আপনিই তো আমাকে আমার পরিবারকে উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অর্থাৎ আপনার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আমার পরিবারের সদস্যরা এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে, তাই আমার পুত্রকে এ মহাপ্লাবন থেকে বাঁচান, যেহেতু সে আমার পরিবারেরই একজন সদস্য।'

'আপনিই সর্বোত্তম শাসক এবং আপনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং আপনার ঘোষিত রায়ের বিরুদ্ধে আবেদনের কোনো সুযোগ নেই। আপনি সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান শাসক। আর আপনার সমস্ত সিদ্ধান্ত জ্ঞান ও পরম ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত।'

আবেদনটির গভীরতা উপলব্ধি

আমাদেরকে এটা স্বীকার করতে হবে যে, নূহ (আ.) যতটা মহান নবী ছিলেন, ঠিক ততটাই তিনি একজন পিতাও ছিলেন বটে।

তিনি তাঁর পরিবার এবং বিশেষত তাঁর সন্তানদের ভালোবাসতেন। সন্তানেরা যতই পথভ্রষ্ট হোক না কেন, কিংবা যতটা পাপী ও বিদ্রোহী হয়ে উঠুক না কেন, পিতামাতা হিসেবে আমরা কখনই তাদের কষ্ট সহ্য করতে পারি না। কোনো পিতামাতাই তাদের চোখের সামনে নিজেদের সন্তানের মৃত্যুকে মেনে নিতে পারেন না। এমন আবেগঘন, বেদনাদায়ক ও অসহায় পরিস্থিতিতে আল্লাহর কাছে যে আর্তনাদ করা হয়েছে, তা এসেছে এক পিতার পক্ষ থেকে, যিনি তাঁর পুত্রকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। নূহ (আ.) না আল্লাহকে অমান্য করেছেন, আর না তিনি তাঁর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করেছেন। বরং তিনি শেষ আশা হিসেবে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করেছেন, যিনিই পারেন তাঁর পুত্রের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিতে। এটা ছিল পিতার পক্ষ থেকে আল্লাহর নিকট বিনয়ের আহাজারি।
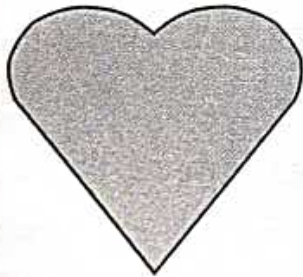
- আল্লাহর সাথে কথা বলার সময় সর্বদা বিনয়ী কণ্ঠ ব্যবহার করতে হবে
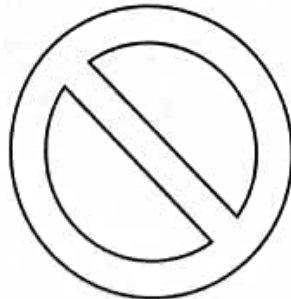
- আল্লাহর সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে রাগান্বিত বা অমার্জিত কণ্ঠ ব্যবহারের তো প্রশ্নই আসে না

শিক্ষা

পরিস্থিতি যতই কঠিন হয়ে উঠুক না কেন; আল্লাহর সাথে আমাদের যে ধরনের কণ্ঠস্বর ব্যবহারের কথা আমরা ঠিক তেমন মার্জিত কণ্ঠস্বর দ্বারাই যেন তাঁকে আহ্বান করি। আপনি আল্লাহর জন্য এমন কণ্ঠস্বর ব্যবহার করতে পারবেন না, যা তাঁর পরিকল্পনা ও ইচ্ছাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, আর না আপনি তাঁর সাথে রাগ দেখাতে পারেন। কেননা, আপনি এমন সত্তার সাথে কথা বলছেন, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি আপনার ভিতর ও বাহির সবই জানেন। আপনি নিজেকে যতটা না ভালোবাসেন, তাঁর থেকেও তিনি আপনাকে বেশি ভালোবাসেন। আপনি আপনার সন্তানকে যতটা ভালোবাসেন, তিনি তার থেকেও তাদেরকে বেশি ভালোবাসেন। কেননা, সবই যে তাঁর আপন হাতে গড়া সৃষ্টি।

আল্লাহ 'আর-রহমান', যখন তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন, তখনও তাঁর রহমত ও ভালোবাসা ওইসব সৃষ্টির জন্য বহাল ছিল, কিন্তু তাঁর রহমত ও ভালোবাসার মাত্রা বা ডাইমেনশন মানুষের উপলব্ধি সীমার বাহিরে। আল্লাহ তা'আলার এমন রহমত ও ভালোবাসা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যখন তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এই বান্দা উদ্ধার হওয়ার যোগ্য নয়, তখন আমাদেরকে তাঁর ফয়সালা মেনে নিতে হবে এবং আমাদের জন্য উচিত হবে না, তাঁর রহমত ও ভালোবাসা নিয়ে কোনোরকম দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগা।

সবকিছুই আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলার এবং সবকিছুই তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। আমাদের সন্তান প্রকৃতপক্ষে আমাদের নয়, বরং তারা আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের নিকট প্রেরিত আমানত। আমরা অবশ্যই তাদের লালন-পালন করবো, তাদের যত্ন নেবো, তাদের যতটুকু হক আছে, তা আদায় করবো, কিন্তু আমরা তাদের মালিক নই। তাদের জন্য কোনটা উত্তম হবে, সে ব্যাপারে তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কেননা, এই দুনিয়াতে ও আখিরাতে কোন জিনিসটি উত্তম, তা আল্লাহ হতে আর কে ভালো জানে?

একটি প্রশ্ন

আল্লাহ তা'আলা যখন নূহ (আ.)-কে তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারটি জানালেন যে, সে কাফিরদের অন্তর্গত, তখন তিনি কেন তাঁর পুত্রের ডুবে যাওয়ার বিষয়টি তাকে জানালেন না?

উত্তর

নবী-রাসূলগণকে বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা ও কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, যেন তাদের অভিজ্ঞতাগুলো সংরক্ষিত হয় এবং যখন আমরা সেগুলো পাঠ করি, তখন আমরা তাদের কষ্ট ও যন্ত্রণাগুলো অনুভব করতে পারি এবং সেগুলো থেকে হেদায়েত গ্রহণ করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির জন্য আদর্শ বা রোল মডেল হিসেবে নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন, তাই তাদেরকে তিনি এমনসব পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সামনে এগিয়ে নেন, যাতে থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি এবং যখন আমরা এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবো, তখন কিভাবে তা মোকাবিলা করতে হবে, তা শিখতে পারি।
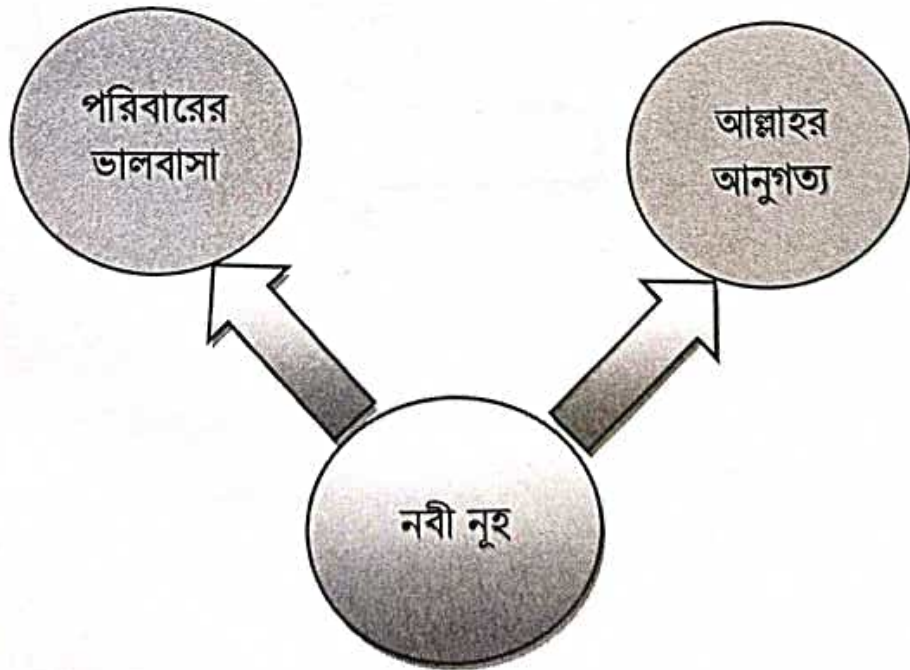
পরিবার

ইব্রাহিমের (আ.) কথা স্মরণ করুন, তিনি বলেছেন, 'যে আমাকে অনুসরণ করে, সে আমার পরিবারের অংশ হয়ে যায়।' নবীদের পরিবার রক্তের সম্পর্ক দ্বারা গঠিত হয় না, বরং তাদের পরিবার ঈমানের দ্বারা গঠিত হয়। আমরা সকলেই নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সাথে যুক্ত। কারণ, এই স্বীকৃতি দিই যে, তিনি (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। আমরা আবু তালিব ও তাঁর পরিবারের কিছু সদস্য, যাদের সাথে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর রক্তের সম্পর্ক রয়েছে, তাদের থেকেও আমরা আমাদের নবী (ﷺ)-এর সাথে বেশি সম্পর্কিত, যেহেতু তারা ঈমান আনেনি এবং আমরা ঈমান এনেছি।
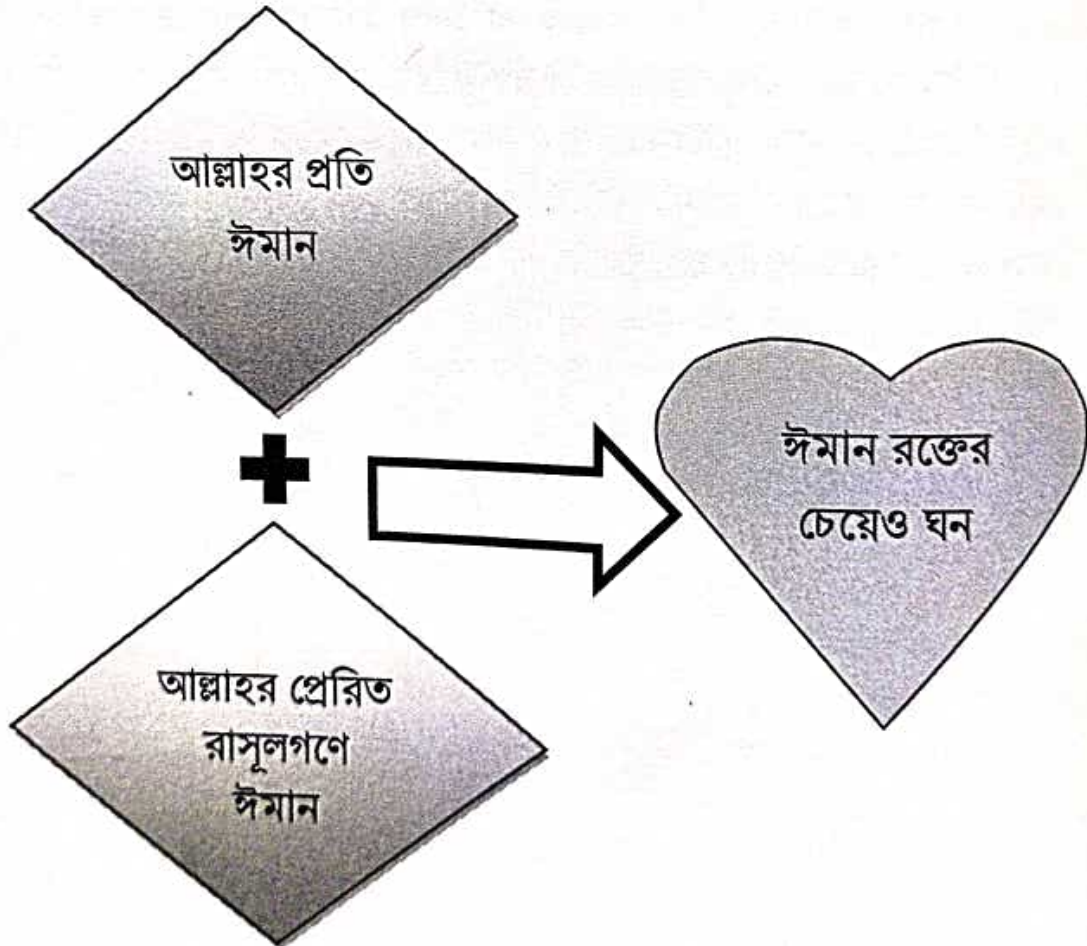
আল্লাহর জবাব

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

জবাবে নূহকে বলা হলো, 'হে নূহ! নিশ্চয় সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে দুরাচার! তাই আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবেন না, যার খবর তুমি জানো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি অজ্ঞদের দলভুক্ত হয়ো না।'

- সূরা হূদ, ১১:৪৬

আল্লাহ নূহের (আ.) অবাধ্য পুত্রের ব্যাপারে বলেন, 'তাঁর আচরণ নেক বান্দাদের মতো ছিল না।' আল্লাহ পিতামাতাকে সন্তানের দায়িত্ব এজন্য দেন যে, যাতে তারা তাদেরকে লালন-পালন করে এবং সদাচারী ও যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর যথাযথ প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারে। পিতামাতার নেওয়া যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সন্তান যদি শিষ্টাচারী ও নেককার না হয়, তবে সন্তানকে উপযুক্ত মানুষ বানানোর যে দায়িত্ব পিতামাতাকে দেওয়া হয়েছে, তা ফলপ্রসূ বা সফল হয়নি। সন্তান যেহেতু পিতামাতার হাতে গড়া জিনিস, সে মোতাবেক এ কাজটিকে মূল্যহীন কাজের সাথে তুলনা করা যায়। নূহের (আ.) পুত্র তেমন হননি, যেমনটি তাঁর পিতা তাকে বানাতে চেয়েছেন। যেহেতু যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নূহের (আ.) প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, সে দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর পুত্র তাঁর পরিবারভুক্ত নয়। আর তাই মহাপ্লাবন শুরু হওয়ার সাথে সাথে ওই অবাধ্য পুত্রের সাথে নবী নূহের (আ.) রক্তের যাবতীয় অধিকারকে কর্তন করা হয় এবং তাকে মহাপ্লাবনের আজাব আস্বাদন করানো হয়।

নূহের (আ.) উদ্দেশ্যে আল্লাহর এ সতর্কবার্তার মর্ম এই নয় যে, নূহ (আ.) ঈমানি দুর্বলতায় ভুগছিলেন অথবা তাঁর ঈমানে ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে কিংবা অজ্ঞ লোকদের মতোই তাঁর বিশ্বাস ছিল। বরং এতে নূহের (আ.) উচ্চতর নৈতিকতার প্রমাণ মেলে। অন্যান্য নবীর মতো নূহ (আ.)-ও একজন মানুষ ছিলেন, তাই তিনি স্বাভাবিক মানবীয় দুর্বলতায় ভুগছিলেন অর্থাৎ সন্তানের প্রতি পিতামাতার ভালোবাসা। এজন্য তিনি তাঁর পালনকর্তাকে অনুরোধ করেন, যাতে তিনি তাঁর

পুত্রকে মহাপ্লাবন থেকে উদ্ধার করেন। আল্লাহ তাকে সতর্ক করে দেন। কেননা, একজন নবীর উচ্চ নৈতিক চরিত্রের দাবি এটাই যে, তিনি নিজের রক্তের সম্পর্কের জন্যেও কোনো অনুরোধ করবেন না, যদি তারা ঈমানের বদলে কুফরি ও শিরক বেছে নেয়। আর তাই যখনই তাকে সতর্ক করা হয় সাথে সাথেই তিনি উপলব্ধি করেন যে, তিনি মানবীয় দুর্বলতার কারণে নবীর উচ্চ পদ থেকে একজন পিতার স্তরে নেমে এসেছেন। তৎক্ষণাৎ নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি অনুতাপ করেন এবং এমনভাবে আচরণ করতে থাকেন, যেন কিছুক্ষণ আগে তাঁর পুত্র মহাপ্লাবনে ডুবে মারা যায়নি। নবী নূহের (আ.) এমন চরিত্র আমাদের নিকট স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য নবী ছিলেন। তিনি আবার নিজের নববী চরিত্রের উচ্চ মাকামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সত্যকে অস্বীকার করা ও তাওহিদের পরিবর্তে শিরককে বেছে নেওয়া পুত্রের জন্য আল্লাহর দরবারে অনুরোধ করার জন্য ক্ষমা চান।

নূহের (আ.) দু'আ

قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِۦ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا
تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِىٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

নূহ বলেন, 'হে আমার পালনকর্তা! যা আমার জানা নেই, এমন কোনো দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হবো।

- সূরা হূদ, ১১:৪৭

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলাকে (সিদ্ধান্তের ব্যাপারে) প্রশ্ন তোলার ব্যাপারে নূহ (আ.) আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। চিন্তা-ভাবনা যখন একটি পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন আমাদের মাথায় নানা ধরনের চিন্তার আবির্ভাব ঘটে। আল্লাহ সম্পর্কে, তাঁর বিচার-ফায়সালা নিয়ে নানা উদ্ভট চিন্তা এবং এমন ধরনের প্রশ্নের উদ্ভব ঘটে, যা বিনয় ও সম্মানের মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায়। যখন আমরা আল্লাহকে সম্বোধন করবো কিংবা তাঁকে ডাকবো, তখন আমাদেরকে অবশ্যই বিনয় ও সম্মান প্রদর্শন করাটা আবশ্যক।

দুই ধরনের সওয়াল রয়েছে

নবী নূহ (আ.) প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে কোনো প্রশ্ন করছেন না, বরং তিনি অত্যন্ত বিনয় ও সম্মানের সাথে এই অনুরোধ জানাচ্ছেন যে,

> ‘হে আল্লাহ, আমার হৃদয়কে এমন কিছুর ভালবাসা থেকে রক্ষা করুন, যা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই যে, তা আমার জন্য ভালো কি মন্দ।’

> ‘হে আল্লাহ, আমাকে এমন কিছু থেকে রক্ষা করুন, যা সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই।’

> ‘হে আল্লাহ, আমাকে এমন কিছু ভালোবাসার হাত থেকে রক্ষা করুন, যা আপনি ভালোবাসেন না।’

আল্লাহ আমাদের ইলম বা জ্ঞান দিয়েছেন এবং এই জ্ঞানের সাহায্যে আমাদের উচিত আমাদের আবেগ ও চিন্তা-চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করা, বিশেষভাবে যখন আমরা সংবেদনশীল ও আবেগঘন পরিস্থিতির মুখোমুখি হই।

প্রথম দৃশ্যপট (বিপথগামী ইচ্ছা)

আল্লাহ আমাদেরকে জ্ঞান দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের মন যা চায়, আমরা তা করতে চাই, এ ব্যাপারে কুর'আন কি বলে তা আমাদের জানার দরকার নেই কিংবা আমরা তার তোয়াক্কা করি না। আমাদের ইচ্ছা ও অনুভূতি যা বলে, আমরা যদি সেটাই করতে নেমে পড়ি, তবে ধরে নিতে হবে যে আমাদের কামনা ও বাসনা আমাদের উপর চেপে বসেছে। এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে বুঝতে হবে যে, আমরা এই নূহের (আ.) এই দু'আ থেকে কিছুই শিখছি না।

যখন আমরা কোনো জিনিস করার ইচ্ছা করি, কিন্তু এটা যাচাই করি না যে, ওই জিনিসটি আল্লাহ তা'আলার দেওয়া শিক্ষা মোতাবেক কিনা, তখন আমরা নিশ্চিতভাবে পথভ্রষ্ট হবো। আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা, তিনি গোটা বিশ্বের বাদশাহ, তিনি ভালো করেই জানেন যে, কোনটা আমাদের জন্য কল্যাণকর আর কোনটা অকল্যাণকর। যখন আমরা আল্লাহ তা'আলার মর্জিকে উপেক্ষা করে কোনো কাজ করি, তখন আমরা নিজেদেরকে সব সময় উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে পাই।

দ্বিতীয় দৃশ্যপট (হেদায়েত বা দিক-নির্দেশনাসমৃদ্ধ ইচ্ছা)

আল্লাহ আমাদেরকে জ্ঞান দিয়েছেন এবং কুর'আন থেকে আমরা তাঁর পবিত্র বার্তা জানতে পারি, জানতে পারি তাঁর শিক্ষা এবং তিনি কোন জিনিস পছন্দ করেন আর কোন জিনিস করেন না। যখন আমরা কোনো কিছু করার ইচ্ছা করি এবং তা আল্লাহর দেওয়া শিক্ষা মোতাবেক কিনা, তা জেনে নিই, তখন তা আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে এবং ওই কাজটি করার ক্ষেত্রে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির বিষয়টিকে সর্বাগ্রে রাখি, তখন কাজটিতে আল্লাহর তরফ থেকে বরকত নেমে আসে।

শিক্ষা

নূহ (আ.) আল্লাহর নিকট এই আবেদন করছেন যে, তিনি যেন তাঁর অন্তরকে ভিন্ন ধরনের ভালবাসা দিয়ে পূর্ণ করেন। আল্লাহ যা পছন্দ করেন, তিনি সে ধরনের ইচ্ছা করতে চান। তিনি চান আল্লাহ যেন তাঁর ভালোবাসার ধরনকে বদলে দেন, যেহেতু তিনি নিজে তাঁর অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নন, বরং আল্লাহই পারেন মানুষের অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে। একইসাথে তিনি আল্লাহর দরবারে ক্ষমাও চাচ্ছেন, অন্যথায় তিনি যে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে যাবেন।

যখন আমরা আমাদের অন্তরকে আল্লাহর আনুগত্য করতে দিই, আসলে সেটাই আত্মসমর্পণ। যদিও তা সহজ কোনো কাজ নয়। কিন্তু আমাদেরকে তা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে, তবেই আমাদের পক্ষে উত্তম ও নেককার মানুষ হওয়া সম্ভব এবং এমনটি আমাদের জীবনে বয়ে আনবে আল্লাহর তরফ থেকে রহমত ও অনুগ্রহ।

নবী ইব্রাহিমের (আ.) দু'আ

১.

নবী ইব্রাহিম (আ.) তাঁর গ্রামবাসীদের সামনে দাঁড়িয়ে দাবি করেছিলেন যে, আল্লাহ সুবাহানু ওয়া তা'আলা একমাত্র উপাস্য এবং এই বিশ্ব জাহানের সকল আধিপত্যের মালিক। কিশোর অবস্থাতেও তিনি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তাকে ভয় করতেন না। তিনি সত্য কথা বলেছিলেন এবং জনসম্মুখে দাঁড়িয়ে এই সত্য উপস্থাপন করে বলেছিলেন যে, তাদেরকে অবশ্যই তাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ বন্ধ করতে হবে এবং সত্য দ্বীনের অনুসন্ধান করতে হবে।

অতপর নবী ইব্রাহিম (আ.) সংক্ষেপে এমন যুক্তি প্রদান করেন, যা কেউই খন্ডন করতে পারেনি। তিনি এটা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন যে, আল্লাহই মানুষের ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র সত্তা। তিনি পরোক্ষভাবে এটা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন যে, তাদের এসব দেবদেবীর ইবাদাতের কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের উপাসনা করা প্রকৃতপক্ষে তাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

নিঃসঙ্গ অবস্থায় তিনি দু'আ করেছিলেন, কারণ তিনি তাঁর বাড়ি এবং পরিচিত সবকিছুর সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন। আক্ষরিক অর্থে তাঁর আর কিছুই ছিল না। আশ্রয়ের জন্য বাড়ি, খাওয়ার জন্য খাবার এবং তাকে দেখাশুনার জন্য কেউ ছিল না। এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও আল্লাহর প্রতি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ও ভালবাসার কমতি ছিল না, যা আমরা তাঁর করা ওই সুন্দর দু'আ থেকে সহজেই অনুধাবন করতে পারি। ওই দু'আ থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের জাতির পিতা নবী ইব্রাহিম (আ)-এর নিকট আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও ক্ষমা ব্যতীত আর কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়।

যখন পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে থাকে, তখন একজন ঈমানদারের ক্ষেত্রে ঈমান সংরক্ষণ করা সহজ। কিন্তু পরিস্থিতি যখন প্রতিকূলে চলে যায়,

তখন আমরা আল্লাহকে প্রশ্ন করতে শুরু করি। সেই সময় আমরা বলি না, হে আল্লাহ, আপনি আমাদের সবকিছুর ব্যবস্থা করে দেন। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের আরোগ্য দান করেন। দিশেহারা বা বিপথগামী হলেও আল্লাহর কাছে দিক-নির্দেশনার জন্য প্রার্থনা করি না। বরং নানা ধরনের প্রশ্ন শুরু করি। কিন্তু ইব্রাহিম (আ.) তাঁর জীবনের সবচেয়ে খারাপ মুহূর্তে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে ভুলেননি এবং বিপদের সময় কিভাবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সরবরাহ করেন, এই বিষয়টি তিনি তাঁর দু'আতে তুলে ধরেন।

দু'আর গঠনপ্রণালী

الَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ

ভাবার্থ: আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা আমাকে সৃষ্টি করেছেন (মূর্তি সৃষ্টি করেনি)। আমাদেরকে কোথায় যেতে হবে এবং কোন পথ অনুসরণ করতে হবে, তা কেবল আল্লাহই বলে দিতে পারেন।

(***দু'আর পর্যায়:*** কোন দিকে যেতে হবে, যখন আমরা তা জানি না)
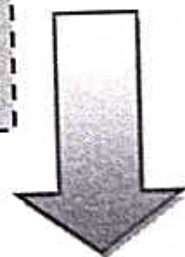
وَالَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ

ভাবার্থ: তিনিই আল্লাহ, যিনি আমাকে খাবার জোগান দেবেন এবং পানীয় পান করাবেন। ঠিক ইব্রাহিমের (আ.) মতো, যার কোনো বাড়ি ছিল না।

(***দু'আর পর্যায়:*** যখন আমরা অনাহারে থাকি)
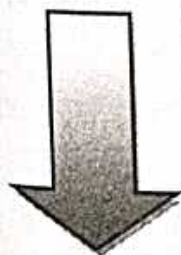
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

ভাবার্থ: যখন আমি অসুস্থ হবো, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য করবেন। যখন ইব্রাহিম (আ.) খাবার ও পানীয় ছাড়া একাই হাঁটছিলেন এবং এর ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তখন আল্লাহ *সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা* তাকে সুস্থতা দান করেছিলেন।

(***দু'আর পর্যায়:*** যখন আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি)
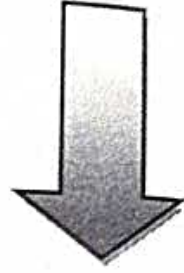
وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ

ভাবার্থ: আল্লাহই আমাকে মৃত্যু দান করবেন এবং তিনিই আমাকে আবার পুনরুত্থিত করবেন। এটা অস্তিত্বের বিনাশ নয়।

(***দু'আর পর্যায়:*** যখন আমরা নিজেদের পুরো সত্তাকে আল্লাহ *সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা*-র নিকট সোপর্দ করি)

আল্লাহ খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করেন, তিনিই পথ প্রদর্শন করেন এবং আরোগ্য দান করেন। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। কিন্তু ইব্রাহিমের (আ.) জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট যে রিজিকের প্রয়োজন, তা হলো: ক্ষমা। পরের আয়াতে তিনি এই দু'আ করেন, হে আল্লাহ! যখন আপনি আমাকে পুনরুত্থিত করবেন এবং আমাকে নতুন জীবন দান করবেন, তখন আপনার ক্ষমাই আমার একান্ত প্রয়োজন।

ইব্রাহিমের (আ.) নিকট, তিনি যদি আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত লাভ করেন, তবে তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যাবেন। তিনি যেকোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত, কিন্তু বিচার দিবসে যদি আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা লাভ না করেন, তবে তাঁর পুরো জীবন যে ব্যর্থ হয়ে যাবে, একথা তিনি ভালো করেই জানেন।

একজন যুবকের পক্ষে সব কিছু ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ কোনো কাজ নয়। কিন্তু তিনি কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা-র নিকট দু'আ করেন। জীবনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে গেলে আমরা ভয় ও বিরূপ পরিস্থিতির কথা ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে পারি না, তখনই আমাদের উচিত নবী ইব্রাহিমের (আ.) করা দু'আর নিকট প্রত্যাবর্তন করা এবং তিনি যে ধরনের দৃঢ়তা ও তাওয়াক্কুল দেখিয়েছেন, তাঁর অনুসরণ করা।

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

ভাবার্থ: আমি আশা করি, বিচার দিবসে তিনি আমার ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন।

ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা-র নিকট নিজের জন্য ক্ষমা ছাওয়া ছাড়া আর কিছুই চাননি। প্রকৃতপক্ষে এটাই উত্তম পন্থা।

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

ভাবার্থ: হে আমার রব (প্রতিপালক), আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

ইব্রাহিম (আ.)-কে তার নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে হবে, এজন্য তিনি দু'আ করেন, যাতে তিনি দৃঢ় থাকেন এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি লাভ করতে পারেন। যেহেতু তিনি তার পরিবারের সঙ্গ হারিয়েছেন, তাই তার প্রয়োজন ভাল মানুষ ও নতুন সমাজ।

وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ

ভাবার্থ: [হে আল্লাহ!] আমাকে পরবর্তীদের মাঝে সত্যভাষী করুন।

ইব্রাহিম (আ.) দু'আ করেন, হে আল্লাহ! আমাকে সত্য কথা বলার সক্ষমতা দেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্য যা করেছি, তা শিক্ষা হিসেবে পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন বানিয়ে দেন। (পরবর্তীকালের মানুষদেরকে অনুপ্রাণিত করতে)।
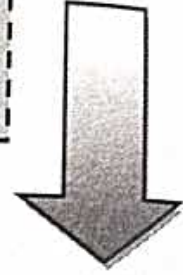
ভাবার্থ: [হে আল্লাহ!] আমাকে জান্নাতুন নায়িম (নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতের) উত্তরাধিকার বানিয়ে দেন।

পিতার কাছ থেকে যে উত্তরাধিকার আসে, তা ইব্রাহিম (আ.) একেবারেই চাননি। তিনি জান্নাতের উত্তরাধিকার চেয়েছেন। বিলাসিতা ও স্বাচ্ছন্দ্য পূর্ণ জান্নাত, কারণ তিনি দুনিয়ার সবকিছু ত্যাগ করেছেন।
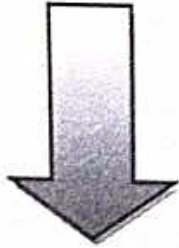
وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ

ভাবার্থ: [হে আল্লাহ!] আমার পিতাকে ক্ষমা করো, (যদিও) সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্গত।

ইব্রাহিমের (আ.) পিতা আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করা সত্ত্বেও তিনি তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে দু'আ করেন।

ইব্রাহিম (আ.) তাঁর পিতার উত্তরাধিকার হারিয়েছিলেন। তিনি শিরকের উত্তরাধিকার চাননি, চাননি পূর্বপুরুষদের থেকে পাওয়া মিথ্যা উত্তরাধিকার, বরং তিনি জান্নাতের উত্তরাধিকার চেয়েছেন। আমরা দুনিয়াতে সর্বদা বিলাসিতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের অনুসন্ধান করি, চাকচিক্যময় জীবন ও খ্যাতির পিছনে ছুটতে থাকি এবং সেটাকে আমরা মুষ্টিবদ্ধ করতে চাই। আমরা দান করতে অনিচ্ছুক, এমনকি বস্তুবাদী জগতের স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশ ছেড়ে দিয়ে সরলতা ও নম্রতা অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে রাজি নই।

আমাদের পিতা ইব্রাহিমের (আ.) এসবই থাকতে পারতো, কিন্তু তিনি সবকিছু ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ, তিনি জানতেন, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। তিনি জানতেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং তাঁকে বন্ধু হিসেবে পাওয়ার থেকে বড় আর কিছুই নেই। তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে জান্নাতের উত্তরাধিকার চেয়েছেন, এটাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত।

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ

ভাবার্থ: [হে আল্লাহ!] আমাকে পরকালে অপমানিত করবেন না।

এটা অপমানজনক, যখন আপনার পিতার অপরাধের কথা ঘোষণা করা হবে। তিনি দুনিয়াতে অপমানের ভয় পান না, কিন্তু আখিরাতের অপমানকে ভয় পান।

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

ভাবার্থ: ওই দিন না ধনসম্পদ আর না সন্তানাদি কোনো কাজে আসবে।

ইব্রাহিম (আ.) সর্বশ্রেষ্ঠ সাদকায়ে জারিয়া ছিলেন, তবুও তার পিতা পুত্র হিসেবে ইব্রাহিমের (আ.) থেকে আখিরাতে কোনো সুবিধা লাভ করতে পারেননি।

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّـهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

ভাবার্থ: কিন্তু (ওই দিন) যে *কালবে সালিম* (পরিশুদ্ধ আত্মা) নিয়ে উপস্থিত হবে (তার বিষয়টি ভিন্ন হবে)।

ইব্রাহিম (আ.) অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করা সত্ত্বেও তিনি সহজ ও সাবলীলভাবে *'কালবে সালিম'* (পরিশুদ্ধ আত্মা) নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হন। এটা সেই উচ্চ মাকাম, যা আমাদেরকে অর্জন করতে হবে।

বিচার দিবসে একমাত্র পবিত্র হৃদয়, পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং অবাধ্যতা ও পাপমুক্ত থাকার মাঝেই মানুষের উপকার নিহিত। ওইদিন সম্পদ, সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না। সম্পদ তখনই উপকারে আসবে, যখন তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যথাযথ স্থানে ব্যয় করা হয়। অন্যথায়, দুনিয়াতে কোটিপতি হলেও আখিরাতে তার কোনো মূল্য থাকবে না। সন্তানাদিও কেবল তখনই উপকারে আসবে, যখন কোনো ব্যক্তি তার সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের সন্তানদেরকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী বানায় এবং তাদেরকে সদাচারে দীক্ষিত করে তোলে। অন্যথায়, ওই সন্তান যদি একজন নবীও হয়, তথাপি তিনি তাঁর অবিশ্বাসী পিতামাতাকে আখিরাতের আজাব থেকে বাঁচাতে পারবেন না।

যখন আমরা ঈমানের এই সুন্দর স্তরে পৌঁছে যাই এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যা বলেছেন, তাতে সাচ্ছন্দ্য বোধ করি, তখন আমরা আমাদের জাতির পিতা ইব্রাহিমের (আ.) করা এই দু'আর স্বাদ আস্বাদন করতে সক্ষম হই।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে তাদের মতো বানান, যারা আপনার সামনে 'কালবে সালিম' (পরিশুদ্ধ আত্মা) নিয়ে বিচার দিবসে উপস্থিত হবে।

আমীন।

২.

ইব্রাহিম (আ.) অনেক পরীক্ষা ও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনি যখন শিশু অবস্থায় চোখ খুলেন, তখন তাঁর চারপাশ বহু ঈশ্বরবাদ ও মূর্তি দ্বারা বেষ্টিত ছিল। তাঁর বাবা ছিলেন এসব মূর্তি-প্রতিমার প্রধান কারিগর। আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহিম (আ.)-কে প্রখর বুদ্ধি ও পরিপক্কতা দান করেন। তিনি ছিলেন ওই সময়কার সকল নির্বোধ মানুষের মাঝে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি। শৈশবকাল থেকেই তিনি যেসব পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন, সেগুলো নিয়ে আমাদের গভীর চিন্তা করা উচিত। এগুলোর আমাদেরকে আমাদের পিতার জ্ঞান ও ত্যাগকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করবে।
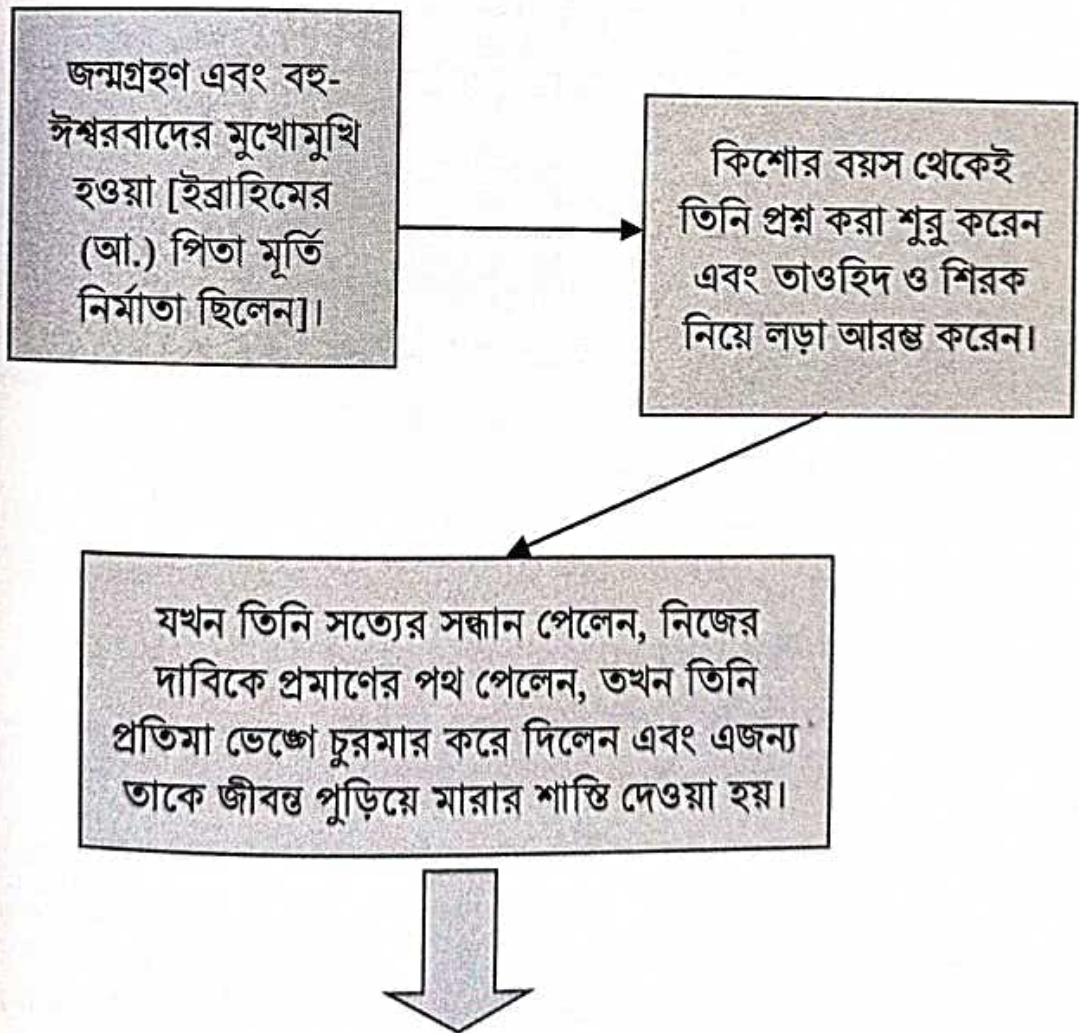
যেহেতু তার গ্রামে কেবল তিনিই এই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আল্লাহই একমাত্র সত্য ও প্রকৃত উপাস্য, তাই তাকে তার গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হয়।

তিনি সারাহ নামক এক নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, কিন্তু ৮৬ বছর হলেও তিনি কোনো সন্তান-সন্ততির মুখ দেখেননি, যা তার জন্যে অন্যতম বড় একটি পরীক্ষা ছিল।

স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে এক বন্ধ্যা মরুভূমিতে ফেলে আসার নির্দেশের মাধ্যমে তিনি আবার পরীক্ষার মুখোমুখি হন।

প্রিয়তম পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানি করার আদেশে লাভের মাধ্যমে তিনি তার জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হন।

নবী ইব্রাহিম (আ.) বৃদ্ধ বয়সে পৌছান এবং এ পর্যন্ত তিনি যেসব পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন, তাতে সফল হন। ইসমাইল (আ.)-কে মক্কায় আনার পর ইব্রাহিম (আ.) দু'আ করেন। আরব মুশরিকদের বিরুদ্ধে আরও প্রমাণ পেশ করার সময় আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেন, মক্কার পবিত্র গৃহটি কেবল লা শরিক (অংশীবিহীন) আল্লাহর ইবাদাতের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি আরও উল্লেখ করেন, এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা ইব্রাহিম (আ.) ওইসব লোকদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন, যারা এক আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করে এবং সেইসাথে তিনি মক্কা নগরীকে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে বিনয়ের সাথে দু'আ করেন।

নবী ইব্রাহিমের (আ.) ওই দু'আর দিকে লক্ষ্য করা যাক,

رَبِّ اجْعَلْ هَـٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا

ভাবার্থ: হে আমার পালনকর্তা, এ শহরকে (মক্কা) শান্তিময় ও নিরাপদ করে দেন।

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ

ভাবার্থ: এবং আমাকে ও আমার সন্তানাদিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন।

(সূরা ইব্রাহিম, ১৪:৩৫)

যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, তার জন্য তাঁর পিতামাতা ও বংশধর এমনকি নিজের জন্যও অনুরোধ করা যথাযথ।

أَمْنٌ) *আমান* - শান্তি): বাংলা পরিভাষা মোতাবেক শান্তি বলতে বুঝি, শান্ত ও সঙ্ঘাতিপূর্ণ অবস্থা, যেখানে কোনো লড়াই বা যুদ্ধ নেই। কোনো কিছুর উপদ্রব নেই, স্থির পুকুরের মতো, যেখানে কোনো ঢেউ নেই।

কুর'আনে যখন أَمْنٌ (আমান) শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা আমরা এখন পর্যালোচনা করবো।

أَمْنٌ: যখন আপনি অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তিত থাকবেন না, তখনই أَمْنٌ অর্জিত হবে। আপনার অতীতে যা ঘটেছে,

বর্তমানে যা ঘটছে কিংবা যা ঘটবে, তার সবকিছু আল্লাহ তা'আলার উপরে ন্যস্ত করলে আপনি শান্তি ও প্রশান্তিময় জীবনে পৌঁছতে পারবেন।

আপনি আপনার যাবতীয় বিষয় আল্লাহ তা'আলার কাছে সমর্পণ করুন, এবং আপনাকে পথ দেখানোর দায়িত্বটুকুও তাঁরই হাতে সোপর্দ করুন। যখনই এমনটি করবেন, তখনই কুর'আনের পরিভাষা মোতাবেক আপনি أَمْنٌ অর্জন করবেন।
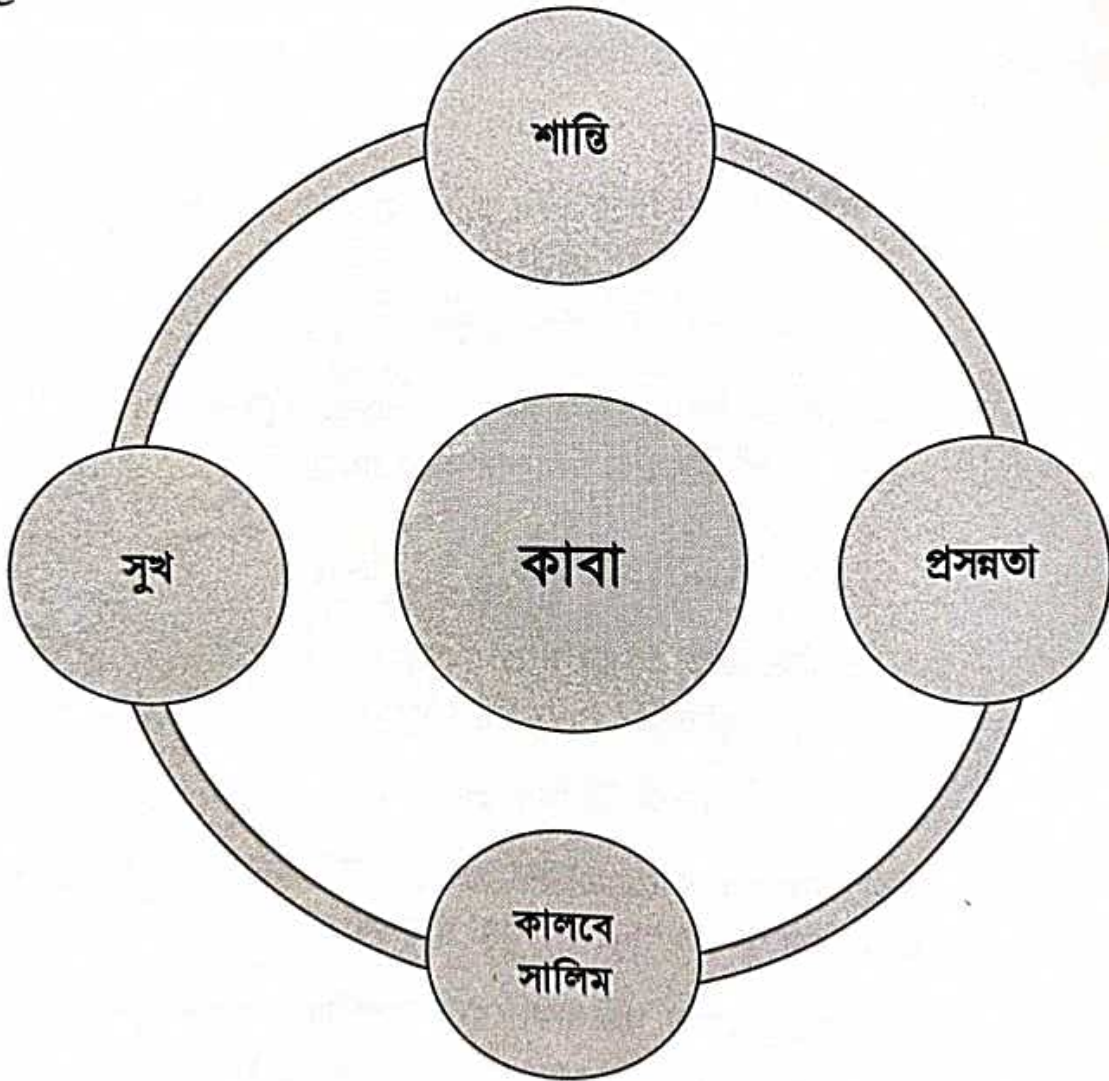
ইব্রাহিম (আ.) এক সুদুরপ্রসারী দু'আ করেছিলেন, তিনি কেবল নিজের হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য দু'আ করেননি, বরং তিনি এর থেকেও মহান কিছুর জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করেছিলেন, যেন মক্কা শহরটি নিরাপদ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ এক স্থানে পরিণত হয়।

এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, এই মক্কা শহরে পৌছানোর আগে আপনার মনে অনেক কিছুরই উদয় ঘটে। যে মুহূর্তে আপনি সেখানে পৌছান এবং শহরের ভিতরে যখন প্রবেশ করেন, তখন আপনার হৃদয়ে শান্তির এক অনুভূতি ও প্রশান্তি বিরাজ করতে শুরু করে। প্রথমবারের মতো যখন কাবার দিকে তাকাবেন, তখন আপনার হৃদয় 'কালবে সালিমে' তথা প্রশান্তি আত্মায় রূপান্তরিত হবে। মক্কার পরিবেশ খুবই কঠিন ও অসহনীয়, তথাপি সেখানে পৌছানোর সাথে সাথে আপনি এক প্রকারের শান্তি অনুভব করতে শুরু করবেন।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا
وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ

'স্মরণ করো, যখন ইব্রাহিম বললো, হে পালনকর্তা, এ শহরকে শান্তিময় করে দেন এবং আমাকে ও আমার সন্তানসন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন।' - সূরা ইব্রাহিম, ১৪:৩৫

যে প্রশ্নটি ভাবায়

যখন ইব্রাহিম (আ.) এই দু'আ করেন, তখন মক্কা শহর মূর্তি ও মূর্তিপূজারীদের থেকে মুক্ত ছিল, তাহলে তিনি দু'আর দ্বিতীয় অংশে কেন মূর্তিদের দিকে ইশারা করলেন?
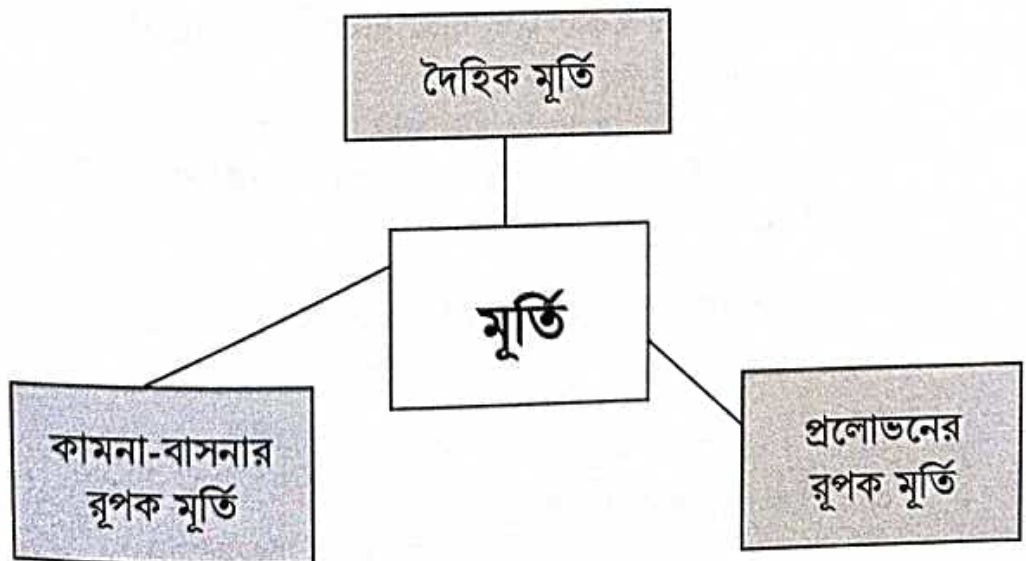
মূর্তি

ইব্রাহিম (আ.) তাঁর সন্তানদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করেন, যাতে তারা মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকে, আক্ষরিক অর্থে আমরা যদি আয়াতটি দেখি তাহলে বুঝতে পারবো যে, এই দু'আর উদ্দেশ্য ছিল তার সন্তানরা যেন বিপদগামী না হয় এবং বহুত্ববাদ যেন মক্কায় আর ফিরে না আসে।

আগেই বলা হয়েছে, দু'আটি যখন করা হয়, তখন মক্কা শহর মূর্তিপূজা থেকে মুক্ত ছিল, সেহেতু এই দু'আর মাঝে মূর্তি বলতে ইব্রাহিম (আ.) কি বুঝাতে চেয়েছেন, তা আমাদেরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে, যা আমাদের মাঝে ও আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে রয়েছে, তাই মূর্তি। এই মূর্তি কেবল আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং একইসাথে আমাদের জীবনকেও পরিচালনা করে। এই মূর্তিগুলিকে আমাদের অযাচিত ইচ্ছা, কামনা-বাসনা ও প্রলোভন হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যখন আমরা সত্য পথ থেকে দূরে চলে যেতে থাকি, তখন আমরা আমাদের ভেতরে এসব প্রতিমা তৈরি করতে থাকি এবং এগুলোকে আরও শক্তিশালী করতে শুরু করি।

এখানে এমনটা বোঝানো হচ্ছে না যে, আপনি আপনার ইচ্ছার উপাসনা শুরু করেন, বরং এই আকাঙ্ক্ষাগুলি পূরণের জন্য আপনার মন ও হৃদয় সবকিছু করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এই অভিলাষগুলি পূরণ করতে শেষমেশ আপনি হারামে লিপ্ত হতে পর্যন্ত কুণ্ঠাবোধ করেন না।

- আপনার অন্তরে এ রকম মূর্তি বাসা বাঁধলে কিভাবে আপনি কালবে সালিম অর্জন করবেন?
- আপনার অন্তরে এ রকম মূর্তি বাসা বাঁধলে কিভাবে আপনি সত্যের গৃহ তৈরি করবেন?
- আপনার অন্তরে এ রকম মূর্তি বাসা বাঁধলে কিভাবে আপনি সঠিক পথে চলবেন?
- আপনার অন্তরে এ রকম মূর্তি বাসা বাঁধলে কিভাবে আপনি আল্লাহকে প্রকৃতভাবে ভালবাসবেন?

আসুন, আমরা আল্লাহর এই বাণীতে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেখে নিই:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّـهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ
عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

'(আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারের বিষয়ে কারও বিশেষ দাবি নেই) হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পন করেছে এবং সে সৎকর্মশীল, তাঁর জন্য তাঁর পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।' - সূরা বাকারাহ, ২:১১২

এই আয়াত দ্বারা আমরা বুঝতে পারি, যারা ঈমান আনে এবং ভাল কাজ করে, তারা শান্তি ও কালবে সালিম পর্যায়ে উন্নীত হবে। কারণ, তাদের অন্তর ভয় ও দুঃখ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। আল্লাহ ঈমানদারদেরকে এক অপরূপ উপহারে সমৃদ্ধ করে রেখেছেন, যা অন্যদের আয়ত্তের বাইরে, আর সেই পুরস্কাটি হলো: أَمْنٌ 'আমান' তথা শান্তি। এটা সাধারণ সুখের মতো নয়, কারণ বড় ধরনের ঝড়ের মাঝেও ওই ঈমানদার বান্দাগণ স্বীয় রবের শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় করতে ভুলে না। তারা জানে যে, জীবন ও মৃত্যু সবই আল্লাহ তা'আলার হাতে। অন্যভাবে বললে, তাঁর অন্তরে বাস করা কোনো মূর্তি কখনও এ জাতীয় প্রশান্তি ও পবিত্র সুখ দিতে সক্ষম নয়, যা সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে ঈমান ও শোকর আদায়ের মাধ্যমে লাভ করে।

নিম্নের আয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ তা'আলা তাদের বিষয়টি তুলে ধরেছেন, যারা নিজেদের হাওয়া (কামনা ও বাসনা)-কে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে গেছে, যেখানে সেগুলো তাদের উপাস্যে পরিণত হয়েছে:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّـهُ عَلَىٰ عِلْمٍ
وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً
فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّـهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

আপনি কি তাঁর প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে নিজের খেয়াল-খুশিকে স্বীয় উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন। তাঁর কান ও অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব,

আল্লাহর পর আর কে তাকে পথ দেখাবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না?' - সূরা জাসিয়া, ৪৫:২৩

إِلَٰهَهُ هَوَاهُ বলতে বোঝায়, যে তাঁর খেয়াল-খুশি, ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার দাসে পরিণত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা যা কিছু নিষেধ করেছেন, সে তা পরোয়া করে না, বরং নিজের যা পছন্দ তা করে, এমনকি আল্লাহ তা'আলা যা আবশ্যক করেছেন, তা যদি তাঁর অপছন্দ হয়, তবে সে তা থেকে বিরত থাকে।

যখন কোনো মানুষ এভাবে কারও বা কোনোকিছুর আনুগত্য শুরু করে, তার মানে দাঁড়াচ্ছে, আল্লাহ তাঁর ইলাহ (উপাস্য) নন, বরং যাকে সে কোনো প্রশ্ন ছাড়াই মান্য করে, সেই তাঁর ইলাহ (উপাস্য)। সে ওই ব্যক্তিকে প্রভু হিসেবে ডাকুক বা না ডাকুক, কিংবা সে ওই জিনিসটির চিত্র তৈরি করে, সেটার পূজা করুক বা না করুক, এতে কিছুই যায় আসে না। বিনা প্রশ্নে সে যখন ওই ব্যক্তির বা জিনিসের আনুগত্য করে চলছে, তখন এমন আচরণই ওই ব্যক্তি বা জিনিসকে দেবতা বানানোর জন্য যথেষ্ট। এমন আচরণকে শিরকের অপরাধ থেকে মুক্তি দেওয়া যায় না, শুধুমাত্র এই কারণে যে, সে তাঁর উপাসনার ব্যক্তি বা বস্তুটিকে নিজের দেবতা বলে অভিহিত করেনি অর্থাৎ জিহ্বা দিয়ে আহ্বান করেনি, কিংবা সেটাকে সিজদাও করেনি।

কুর'আনের শীর্ষস্থানীয় তাফসিরবিদগণ এই আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। ইবনে জারির তাবারি বলেন, আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা হারাম। আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেননি, তা হালাল। যে ব্যক্তি নিজের কামনা-বাসনাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে, সে আল্লাহ কর্তৃক হালাল করা জিনিসকে হালাল মনে করে না এবং আল্লাহ কর্তৃক হারাম করা জিনিসকে হারাম মনে করে না।

আবু বকর আল-জাসসাস এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি নিজের কামনা-বাসনাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে, সে তাঁর কামনা-বাসনাকে ঠিক সেভাবে মান্য করে, যেভাবে তাঁর উচিত ছিল আল্লাহকে মান্য করা।

জামাখশারী এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ ধরনের ব্যক্তি নিজের ইচ্ছের প্রতি বাধ্য থাকে। তাঁর কামনা-বাসনা তাকে যেদিকে যেতে বলে, সে দিকেই যায়।

উপসংহার

আমাদের সকলের উচিত নিজেদের ভিতরে থাকা প্রতিমাগুলোর উপর তদারকি জোরদার করা, যেন আমাদের কামনা-বাসনা আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু না করে। নিজেদেরকে আল্লাহ তা'আলার সাথে সংযুক্ত করা এবং কিভাবে হৃদয়ের সত্যিকার প্রশান্তি আসে, তাঁর অনুসন্ধানে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখা।

৩.

নবী ইব্রাহিমের (আ.) আরেকটি দু'আ নিয়ে আসুন আমরা পর্যালোচনা শুরু করি।

رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

'হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি; হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা সালাত (নামাজ) কায়েম রাখে। অতপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন; এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রিজিক দান করুন, সম্ভবত তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।' - সূরা ইব্রাহিম, ১৪:৩৭

এটি একটি দু'আ, কিন্তু ইব্রাহিম (আ.) কেন এই দু'আ করছেন, তার মর্ম উপলব্ধির জন্য আমরা একে চারটি অংশে বিন্যস্ত করবো।

সংক্ষেপে বলা যায়, যখন নবী ইব্রাহিম (আ.) বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হন, তখন তিনি এই দু'আ করেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই দু'আ কবুল করেন। যেমনটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই সূরাটি নাজিল হওয়ার সময় সমগ্র আরব থেকে লোকেরা হজ্জ এবং উমরাহ করতে এখানে আসতো এবং বর্তমানে গোটা পৃথিবী থেকে মানুষ দলে দলে সেখানে ভিড় করে।

দু'আর প্রথম অংশ: হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি।

এই দু'আ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মক্কাকে আবাদ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহিম (আ.)-কে যে আদেশ দিয়েছিলেন, তিনি নিজের স্ত্রী ও সন্তানকে এখানে রেখে আসার মাধ্যমে তা পূর্ণ করেন।

ইব্রাহিমের (আ.) সন্তানগণ পিতার আদেশ মান্য করে এবং বংশ বৃদ্ধির পাশাপাশি তারা নিজেদের মাঝে পিতা ইব্রাহিমের (আ.) শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে থাকে।

বর্তমানে আমরা আমাদের সন্তানদের নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিতের জন্য সবকিছুর আয়োজন করতে প্রস্তুত থাকি। চেষ্টা করি যেন তারা সুখে জীবনযাপন করতে পারে। এক্ষেত্রে যদি দ্বীন ও ঈমানের সাথে আপস করতে হয়, তবে তা করতে পিছপা পর্যন্ত হই না।

নবী ইব্রাহিম (আ.) থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত, যেখানে তিনি তাঁর সন্তানদেরকে এমন এক জায়গায় রেখে আসেন, যেখানে গাছপালা খুবই কম ছিল এবং পরিবেশ ছিল বেশ প্রতিকূল। তিনি এমনটি করেছেন এই কারণে যে, তিনি চাইতেন আমাদের আগত প্রজন্ম যেন আল্লাহ তা'আলার ঘর থেকে দূরে না থাকে এবং তাদের মাঝে সত্য ও ন্যায়কে সমুন্নত রাখে, এমন একটি প্রজন্ম গড়ে উঠুক। জীবনে আমরা যত সিদ্ধান্ত নিই না কেন, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের উচিত দ্বীনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া এবং এই শিক্ষাকে আমাদের সন্তানদের ছড়িয়ে দেওয়া। এই কাজটি আমরা তখনই বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবো, যখন আমরা আমাদের পিতার আদর্শকে সত্যিকারভাবে অনুসরণ করবো।

দু'আর দ্বিতীয় অংশ: হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা সালাত (নামাজ) কায়েম রাখে।

এটা সহজেই বোধগম্য যে, নবী ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহর নিকট এই দু'আ করেছিলেন, যাতে তাঁর সন্তান ও আগত প্রজন্ম সঠিক সময়ে সালাত আদায় করে এবং একাগ্রতা ও বিনয়ের সাথে সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাথে সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়। কিন্তু 'কায়েম' শব্দটির তাৎপর্য বেশ গূঢ়।

আসুন আমরা 'সালাত কায়েম করা' বাক্যের অন্তর্নিহিত মর্ম অনুধাবনের চেষ্টা করি:

সালাত কায়েম করার মানে হচ্ছে, যথাসময়ে সালাত আদায় করা নয়, বরং এর অর্থ হলো, সালাতকে প্রতিষ্ঠা করা। যখন আমরা সালাত কায়েমের মর্ম উপলব্ধি করবো, তখন আমাদের জীবন এই সালাতের চারপাশে আবর্তন করবে এবং আমরা কখনই সালাত আদায়ে এক মুহূর্তও গাফেলতি করবো না। আল্লাহর দৃষ্টিতে সালাত ও ঈমান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের জন্য আবশ্যক হলো, আমরা এমনভাবে সালাত কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করবো, যা আমাদের কাজে-কর্মে প্রতিফলিত হবে। পরিবার-পরিজন ও অন্যান্য মানুষের সাথে আমরা যেরূপ আচরণ করি, তা থেকে আমাদের জীবন-দর্শন প্রতিফলিত হয়, তাই আমাদেরকে এমন জীবন-দর্শন গড়ে তুলতে হবে, যা সালাত কায়েমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সালাত কায়েমে অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করা হবে ইব্রাহিমের (আ.) আদর্শকে অনুসরণের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সালাত কায়েম করা

সালাতের মধ্যে আছে জিকির, কুর'আন, সিজদা, দু'আ, নম্রতা, নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুসরণ, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়াতে সমস্ত কিছু ত্যাগ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি। সালাত আদায় প্রমাণ করে যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার দাস ছাড়া আর কিছুই নই এবং তিনিই আমাদের রব বা প্রভু। খাঁটি ঈমানের সাথে যখন আমরা এই কাজটি করি, তখন আমরা তাঁর সাথে একটি মজবুত সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি।

দু'আর তৃতীয় অংশ: অতপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন।

এই অংশটুকু নবী ইব্রাহিমের (আ.) দু'আর দ্বিতীয় অংশের সাথে সম্পর্কিত। যখন আমরা সঠিক পদ্ধতিতে সালাত কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করি, তখন স্বাভাবিকভাবেই মানুষজন ঈমানদারদের প্রতি নরম হয়ে থাকে। নবী ইব্রাহিম (আ.) কখনই চাইতেন না যে, তাঁর সন্তান ও আগত প্রজন্ম তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় বিনষ্ট হোক। বর্তমানে নানা ধরনের মিথ্যা মতবাদ ও ফিতনার বিস্তৃতির কারণে অনেকেই তাদের বিশ্বাস ও ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলছে। এজন্য দু'আর এই অংশটুকু আমাদের জন্য প্রযোজ্য, যেন আমাদের দ্বারা অন্যরা অনুপ্রাণিত হয়। যখন আমরা ভালো ও কল্যাণকর কোনো কিছু করবো, তখন তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করি।

বিশ্ব নবী মুহাম্মদ (ﷺ) কুরাইশদের নিকট কুর'আনের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করে শোনান, যেহেতু তারা কাবাগৃহ দেখাশুনা করতো। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে তাদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেন, যা তারা পরিত্যাগ করেছিল, এমনকি তারা সালাত প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়। আসলে এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে একটি নীরব সতর্কবার্তা পাঠান এবং নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-কে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, তারা যেসব অন্যায় করেছে, তার জন্য তারা কোনো ছাড় পাবে না। প্রতিটি কর্ম তিনি দেখছেন এবং প্রতিটা জিনিসের হিসাব তিনি নেবেন। নবী ইব্রাহিমের (আ.) এই দু'আর কারণে কুরাইশ সম্প্রদায় এখনো মানুষের থেকে সম্মান পেয়ে থাকে।

দু'আর চতুর্থ অংশ: এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রিজিক দান করুন, সম্ভবত তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

নিজের সন্তান ও পরবর্তী উত্তরাধিকারের প্রতি নবী ইব্রাহিমের (আ.) যে ভালোবাসা ছিল, তা এই দু'আর মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়, যেহেতু তিনি চান না যে, তারা কোনো ধরনের রিজিক থেকে বঞ্চিত হোক। তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বোত্তম যে রিজিকের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, তা হলো: হৃদয়ের রিজিক, যাতে তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং রবের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে পারে। দ্বিতীয় রিজিক প্রথমটির সাথে জড়িত, আর তা হলো: তাঁর উত্তরসূরীরা যেন অন্য সবার জন্য পথ-নির্দেশনার উৎস হতে পারে এবং তারা যেন মানুষকে ভালো কাজে অনুপ্রাণিত করতে পারে ও মন্দ কাজের বিলুপ্তি ঘটাতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ যেন ইব্রাহিমের (আ.) সন্তানদেরকে ফল ও রুজির ব্যবস্থা করে দেন, এই বিষয়টি তিনি দু'আর এই অংশে তুলে ধরেছেন। যাতে তাদেরকে এই দুনিয়াতে কোনো কিছুর জন্য চিন্তা করতে না হয় এবং একনিষ্ঠভাবে তারা আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে এবং পিতার উত্তরাধিকারকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়।
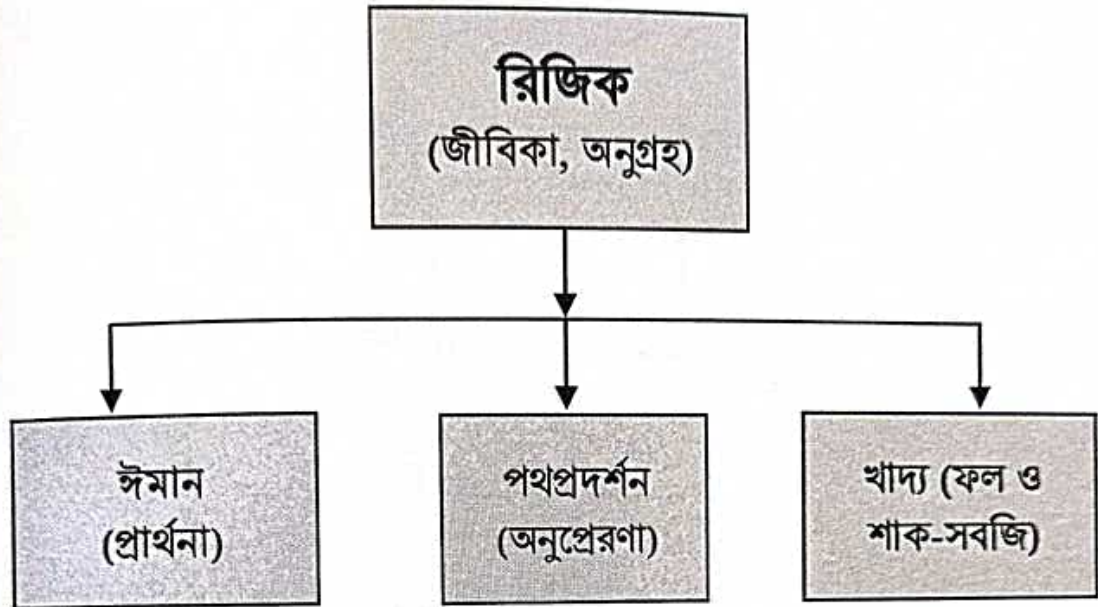
কৃতজ্ঞতা

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে মূল্যবোধ ও সর্বাধিক মূল্যবান যে উপহার আপনি আপনার সন্তাদেরকে দিতে পারেন, তা হলো: আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে শেখানো। তাদের যা আছে, তার জন্য যখন তারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, তবে তারা প্রশান্তি লাভ করবে এবং তাদের অন্তর কালবে সালিমে পরিণত হবে। তাদের জীবনে যত কঠিন পরিস্থিতি আসুক না কেন, তারা ভালো করেই জানে, আল্লাহর পরিকল্পনা কখনো ভুল হতে পারে না এবং তিনি তাঁর নিষ্ঠাবান বান্দাদের নিকট থেকে কঠিন পরীক্ষা নিয়ে থাকেন।
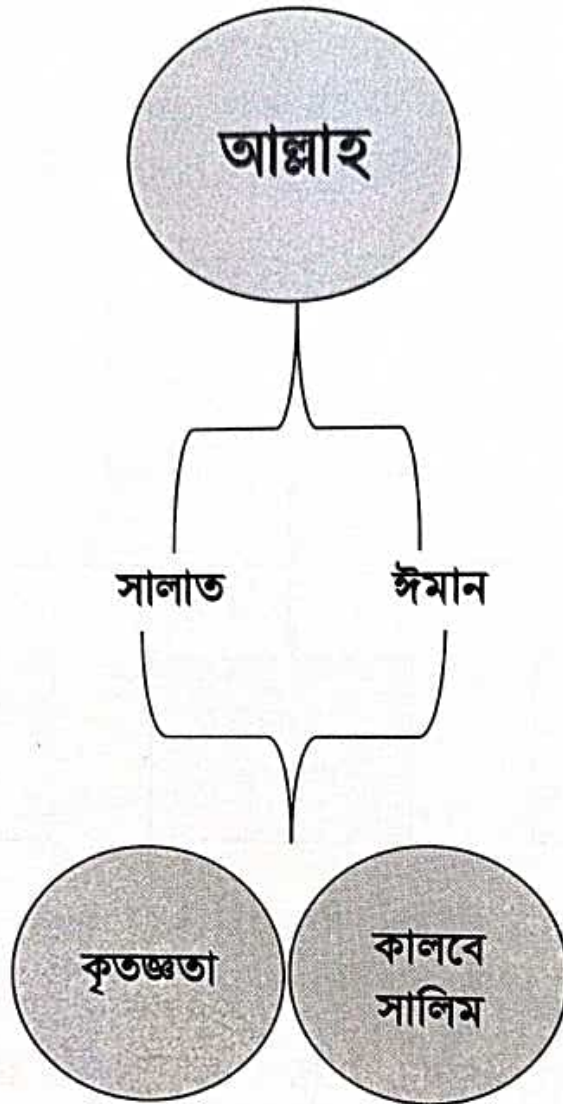
নবী ইব্রাহিমের (আ.) যেসব দু'আ ও তাদের তাৎপর্য আমরা অবগত হলাম, সেগুলো হতে উপদেশ গ্রহণের তাওফিক আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে দেন। আমিন।

নবী ইউসুফের (আ.) দু’আ

পেছনের ঘটনা

ইউসুফ (আ.) যে মন্ত্রীর অধীনে কর্মরত ছিলেন, সেই মন্ত্রীর স্ত্রী নিজের বিয়ে নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর অসুখী হওয়ার কারণে শয়তান প্রায়শই তাকে কুমন্ত্রণা দিত। তিনি তাঁর চারপাশে ঘুরে বেড়ানো এক সুদর্শন ও তরুণ চাকরকে দেখতেন এবং তাকে নিয়ে কল্পনা করতেন। সাধারণত পুরুষরাই নারীদের জন্য উতলা হয় এবং তাদেরকে পেতে চায়।

আরবিতে সাধারণত যে প্রাণীরা শিকার করে তাদের নাম পুরুষবাচক হয়ে থাকে এবং যে প্রাণী শিকার হচ্ছে তার নাম স্ত্রীবাচক হতে থাকে।

কিন্তু এই ইউসুফের (আ.) ঘটনাতে পুরুষের মোহে নারী দিওয়ানা হয়েছে, যা সাধারণ অবস্থার বিপরীত। সাধারণত নারী একজন পুরুষের মাঝে বুদ্ধি, মর্যাদা, প্রতিভা ও শক্তি অনুসন্ধান করে। মিশরের একজন মন্ত্রীর স্ত্রী এই নারী অভিজাত পরিবারের একজন এবং খুবই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, তথাপি তিনি একজন দাসের প্রতি আকৃষ্ট হন। এটা পরিষ্কার, ওই দাসের বাহ্যিক অবয়বে যেমন অস্বাভাবিকতা রয়েছে, তেমনি ওই নারীর মনস্তত্ত্বেও রয়েছে অস্ভাবাবিকতা।

ইউসুফের (আ.) পরিস্থিতি

যুবক ইউসুফ (আ.) তাঁর পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাকে দিকনির্দেশনা দেওয়া, রক্ষণাবেক্ষণ করা, পথ বাতলে দেওয়া, সঠিক ও ভুল বলে দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে তাঁর পিতামাতা ছিল না। আর না তাঁর চারপাশে কোনো ঈমানদার ছিল, যে তাকে ধর্ম সম্পর্কে শেখাবে। তিনি বয়ঃসন্ধিকালে পৌছান এবং এমন পরিস্থিতিতে যুবক হিসেবে খুব সহজে ফিতনাহ ও অন্যান্য গুনাহের কাজে পতিত হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল।
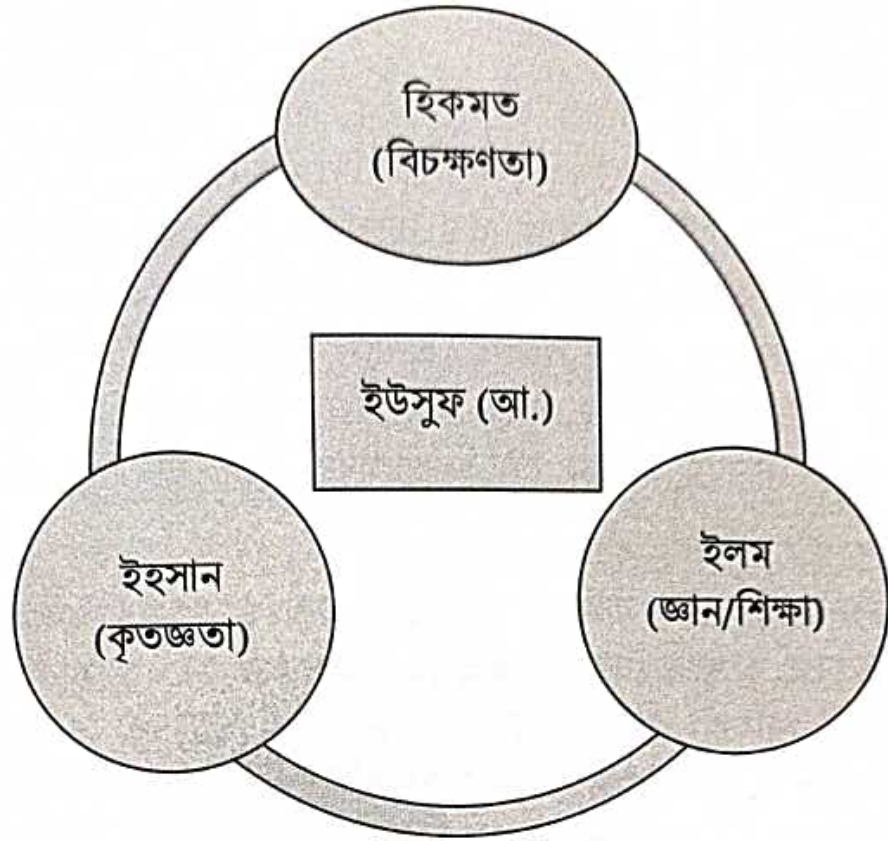
আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা ইউসুফ (আ.)-কে তিনটি সুন্দর বৈশিষ্ট্য দিয়েছিলেন:

১ হুকমান: যুক্তিযুক্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত নিতে তৎপর হওয়া।

২ ইলমান: বুদ্ধিমত্তার সাথে জ্ঞানের সাহায্যে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা।

৩ ইহসান: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

মন্ত্রীর স্ত্রী যখন তাকে পদস্খলন করানোর মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রহীণ করার চেষ্টা করে, তখন ইউসুফ (আ.) এই তিনটি গুণ ব্যবহার করেন। মন্ত্রীর স্ত্রী চেষ্টা করছিলেন যেন নৈতিক স্খলনের পাশাপাশি ইউসুফ তার আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ইউসুফ (আ.) অত্যন্ত সংযত ও মার্জিত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং আল্লাহর অবাধ্য হলে তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়াকে তিনি ভীষণ ভয়

করতেন। তাই তিনি নিজেকে পাপ কাজ থেকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইউসুফের (আ.) পিতা জানিয়েছেন, কারো বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য বোঝার ক্ষমতাও আল্লাহ ইউসফ (আ.)-কে দিয়েছেন। যখন মন্ত্রীর স্ত্রীর কক্ষে ইউসুফ (আ.) তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত ছিলেন, তখন ওই নারী সম্ভাব্য সকল দরজা ও জানালা আটকে দেয়, যাতে ইউসুফ (আ.) পালাতে না পারে। তারপর তিনি ইউসুফ (আ.)-কে ডেকে বলেন, 'এখানে দ্রুত আসো।' এই শব্দগুচ্ছ দ্বারা তিনি বহুবার ইউসুফ (আ.)-কে ডেকে থাকলেও কারো বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য বোঝার ক্ষমতা থাকায় ইউসুফ (আ.) তৎক্ষণাৎ বুঝে যান যে, এবারের অর্থ অন্যরকম।

তিনি ওই নারীর কণ্ঠস্বর, শারীরিক ভাষা ও অঙ্গভঙ্গিতে যে বিপদের আলামত রয়েছে, তা বুঝে ফেলেন। তাই তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করেন:

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

'সে বললো, আল্লাহ রক্ষা করুন; আপনার স্বামী আমার মালিক। তিনি আমার আবাসের সুন্দর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই জালিমরা সফল হয় না। '

- সূরা ইউসুফ, ১২:২৩

নিজের মনিবের স্ত্রীর সাথে রাত কাটানোর সামান্য চিন্তাকে মন থেকে তাড়িয়ে তিনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান এবং এরূপ জটিল পরিস্থিতি থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার চেষ্টা চালিয়ে যান। সম্ভবত ইউসুফ (আ.) বহুবছর ধরে ওই নারীর এমন ইচ্ছাকে প্রতিহত করে আসছিলেন। মিশরীয় সমাজের উচ্চপদস্থ ধনী সুন্দরী মহিলা এত সহজে নতি স্বীকার করবেন না। তাঁর সৌন্দর্য, মর্যাদা ও সম্পদ দ্বারা বেশিরভাগ পুরুষরাই তাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ডুবে যাবে, তা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ইউসুফ (আ.) সাধারণ মানুষের মতো ছিলেন না। তিনি আল্লাহর সাহায্য চান এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে উদ্ধার করেন।

ইউসুফ (আ.) মন্ত্রীর স্ত্রীর হাত থেকে পালাতে চাইলেন। কারণ তাঁর এই অস্বীকৃতি ওই নারীর আবেগকে কেবল বাড়িয়েছে। মানসিক সমস্যাযুক্ত একজন নারী হিসেবে তিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন যে, তিনি ইউসুফকে বাগে আনার চেষ্টা ছাড়বেন না। যেহেতু বিষয়টি তাঁর ইগো বা আত্মমর্যাদায় আঘাত হেনেছে।

দু'আটির মর্ম গভীরভাবে উপলব্ধি করা

ইউসুফ (আ.) তাঁর দু'আতে বলেন, 'আমার পালনকর্তা আমাকে রিজিক দিয়েছে', এর বাক্যের মাধ্যমে ভাইদের হাতে কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য যা কিছু করেছেন, তাঁর সবকিছুকে স্বীকৃতি দেন। আল্লাহ তাকে সব মন্দ চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেন এবং মন্ত্রীর প্রাসাদে নিরাপদে নিরাপত্তার সাথে ফিরিয়ে আনেন। আল্লাহ তাঁর জন্য খাবার, আশ্রয় ও পোশাকের ব্যবস্থা করেন। সর্বোপরি আল্লাহ ইউসুফের (আ.) দেখভালের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তাই তিনি এটাই ভাবলেন, কিভাবে তিনি আল্লাহর আইন ও তাঁর আস্থাকে লঙ্ঘন করতে পারেন? যেখানে আল্লাহ তাঁর প্রতি এত রহম করেছেন, সেখানে কিভাবে তিনি এমন অপরাধ করে অকৃতজ্ঞ হতে পারেন? যদি তিনি জিনার অপরাধটি করতেন, তবে তা সরাসরি তাঁর ঈমানকে আঘাত হানতো এবং আল্লাহর দেওয়া রহমত ও সুরক্ষা তাঁর থেকে তুলে নেওয়া হতো।

ইউসুফ (আ.) তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও আল্লাহর প্রতি তাঁর শুকরিয়াকে কাজে লাগিয়ে মন্ত্রীর স্ত্রীর নিকট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিয়ে পদস্খলনের আগেই নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। তিনি জানতেন, একমাত্র আল্লাহই তাকে এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচাতে পারেন এবং এমন অপমানজনক কাজ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ তাঁর দু'আ শুনেন এবং তাকে উদ্ধার করেন। কুর'আন থেকে আমরা ইউসুফের (আ.) সততা সম্পর্কে জানতে পারি এবং অপরাধী যে মন্ত্রীর স্ত্রী ছিল, তা অবগত হই।

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ

فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ۚ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ

তারা দুজন দরজার দিকে দৌড়ে গেল এবং মহিলা ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেললো। তারা মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলা বললো, যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তাকে কারাগারে পাঠানো কিংবা অন্য কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া ছাড়া তার আর কি প্রতিফল হতে পারে?

ইউসুফ বললেন, সে আমাকে দৈহিক মিলনে প্ররোচনা দিয়েছিল এবং মহিলার পরিবারের একজন সাক্ষী দিল, যদি তাঁর জামা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদী। আর যদি তাঁর জামা পেছনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা মিথ্যাবাদিনী এবং সে সত্যবাদী।

অতপর গৃহস্বামী যখন দেখলো যে, তাঁর জামা পেছনের দিক থেকে ছিন্ন, তখন সে বললো, নিশ্চয় এটা তোমাদের ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক। ইউসুফ এ প্রসঙ্গ ছাড়! আর হে নারী, এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিঃসন্দেহে তুমি-ই পাপাচারিনী।'

- সূরা ইউসুফ, ১২:২৫-২৯

তথাপি সত্যিকারের বিশ্বাসঘাতক কে এবং ওই মন্ত্রী কাকে বিশ্বাস করবেন, তা ভেবে উঠতে পারেননি। যদিও তিনি তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তথাপি ইউসুফের (আ.) সততা ও মহৎ চরিত্রের বিষয়টিও তাঁর ভালভাবে জানা ছিল। তাহলে দুজনের মধ্যে কে সত্য বলছে?

মন্ত্রীর পরিবারের একজন ইউসুফের (আ.) সত্যবাদিতার দিকে ইশারা করে সাক্ষ্য দিয়েছিল।

ইউসুফ (আ.) নবী ছিলেন এবং তাঁর বংশও নবীবংশ ছিল। তাই তাঁর পালনকর্তা তাকে অশ্লীল কাজ এবং ওই নারীর মন্দ পরিকল্পনা থেকে রক্ষা

করেন। বিচার দিবসে যারা আরশের ছায়াতলে থাকবে, তাদের মধ্যে ইউসুফ (আ.) অন্যতম। নবী মুহাম্মদ (ﷺ) ব্যাখ্যা করেন, কিয়ামতের দিন সূর্যের উত্তাপ আরও ভয়ানক হবে এবং মানুষেরা সেই উত্তাপের মধ্যে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহর তা'আলার নিকট বিচারের জন্য অপেক্ষা করবে। সেখানে সাত শ্রেণির মানুষ এই অসহনীয় উত্তাপ থেকে রক্ষা পেয়ে আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে। তাদের একজন হলেন এমন ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর ভয়ে সুন্দরী নারীর প্রলোভন উপেক্ষা করেছিলেন। (বুখারি)

প্রমাণ ছিল একেবারে ভুলহীন। ইউসুফের (আ.) মনিব (মন্ত্রী) একজন জ্ঞানী ও ন্যায়বান মানুষ ছিলেন এবং ওই নারীটি যেহেতু তাঁর স্ত্রী, সে কারণে তিনি তাকে বহিষ্কার বা বিতাড়িত করার চেষ্টা করেননি। বরং তিনি সত্যতা যাচাই করতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং যখন দেখলেন যে, ইউসুফের (আ.) জামা পেছন থেকে ছেঁড়া, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেন, 'নিশ্চয় এটা তোমাদের ষড়যন্ত্র। নিশ্চয় তোমাদের ষড়যন্ত্র ভয়ানক' (সূরা ইউসুফ, ১২:২৮) এবং তিনি তাঁর যুবক দাসের দিকে ফিরে গিয়ে তাকে ঘটনাটি গোপন রাখতে বলেন, যাতে কেউ যেন না জানে যে, এমন কিছু ঘটেছিল। এরপর আবারও তিনি তাঁর স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলেন, 'আর (আমার স্ত্রী) তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় তুমি পাপীদের অন্তর্ভুক্ত।' (সূরা ইউসুফ, ১২:২৯)

এই পর্বটি ইউসুফের (আ.) জীবনে সংঘটিত বড় বড় বিষয়গুলির সূচনা ছিল মাত্র।

শিক্ষা

১. আমাদের যখন এমন পরিস্থিতিতে থাকবো এবং আমাদের পক্ষে লড়াই করার মতো কেউ নেই, তখন আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন, আমরা অপরাধকে (পাপ) আমাদের ঈমানকে আঘাত করার সুযোগ দেবো না। আমাদেরকে অবশ্যই ন্যায়ের জন্য দাঁড়াতে হবে। জ্ঞান, প্রজ্ঞাবিশিষ্ট যেসব দু'আ আমরা আমাদের নবী-রাসূলদের থেকে শিখেছি, তা ব্যবহার করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের উচিত আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া।

২. আমাদেরকে অবশ্যই সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর অনুগ্রহগুলি স্মরণে রাখতে হবে। আল্লাহ আমাদের যে অনুগ্রহ দান করেছেন, তা মনে রেখে আমরা যখন তাঁর আনুগত্য বিরোধী কিছু করার প্রবণতা বোধ করি, তখন তা আমাদেরকে পেছনে টেনে নিয়ে যায়। কিভাবে আমরা আল্লাহর রজ্জুকে ছেড়ে দিতে পারি, যেখানে আমাদের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে ছেড়ে দেন না?

৩. যারা এই জীবনে ভুল করে, তারা কখনই এই জীবনে সফলতা পাবে না, যতই তারা এখন ভাল অনুভব করুক না কেন। তরুণদের উচিত আল্লাহকে আঁকড়ে ধরা ও তাঁর কাছে প্রতিনিয়ত আশ্রয় কামনা করা, বিশেষ করে ওইসব পরিস্থিতিতে যখন আল্লাহর অবাধ্য হওয়াটা বেশি সম্ভাবনাময়। যত কষ্টকর মনে হোক না কেন, জীবনে সফল হতে গেলে তাদেরকে অবশ্যই এমন পরিস্থিতি থেকে নিরাপদ থাকতে হবে, যেখানে তারা জিনা-ব্যভিচারের মতো পাপে জড়িয়ে পড়তে পারে কিংবা এমন কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে, যা তাদেরকে জিনা-ব্যভিচারের দিকে ধাবিত করে।

৪. আপনি যদি সত্যিই কাউকে ভালোবাসেন এবং সে ভালোবাসা যদি হালাল সম্পর্ক না হয়, তাহলে ওই সম্পর্ক থেকে ফিরে আসুন এবং ওই মানুষটি ও আপনার নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনের কল্যাণের জন্য এই হারাম সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসুন। প্রকৃত ও সত্যিকারের ভালবাসার তো সেটাই, যখন আপনি চাইবেন না যে, আপনার ভালবাসার মানুষ আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়েছে। আপনি তাদেরকে ছেড়ে দেবেন এই কারণে যে, আপনি তাদের আখিরাতকে ধ্বংস করতে চান না এবং চান না যে, তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলুক।

৫. যদি একজন নবী এত জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও সুরক্ষিত হওয়ার পরেও শয়তানের প্রতারণার ফাঁদ থেকে রক্ষা না পান, তাহলে এখান থেকে আমাদের সবার শিক্ষা নেওয়া দরকার যে, আমরা তো কিছুই নই। এটি খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার, তাই আমাদেরকে কুর'আনের সাথে সংযুক্ত হয়ে নিজেদেরকে রক্ষা করা এবং আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করা।

ইউসুফের (আ.) সাথে নারীদের সাক্ষাৎ

ইউসুফ (আ.) ও মন্ত্রীর সুন্দরী ও অভিজাত স্ত্রীর মধ্যে যা ঘটেছিল, ওই বিষয়টি অতিশীঘ্রই ফাঁস হয়ে যায় এবং শহরের অভিজাত নারীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ চালাতে থাকে যে, কিভাবে সে নিজের খ্যাতি, মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে একজন দাসের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে?

এই আলোচনা শীঘ্রই মন্ত্রীর স্ত্রীর কানে পৌঁছায়। একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ নারী হিসেবে শহরের রাজনীতির কলা-কৌশলের ব্যাপারে পারদর্শী হওয়ায় তিনি ওইসব অভিজাত নারীর সমালোচনা দ্বারা দমে যাওয়ার কেউ ছিলেন না। তাই তিনি তাদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য একটি সূক্ষ্ম পরিকল্পনা তৈরি করেন।

তিনি তাদেরকে নিজ প্রাসাদে ভোজ উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ জানান। যখন তাঁর প্রাসাদে উপস্থিত হয়, তখন তিনি তাদের প্রত্যেকের হাতে ফল কাটার জন্য একটি ছুরি দিয়ে দেন।

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ
مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ
عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ
حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ

'যখন সে তাদের চক্রান্ত শুনলো, তখন তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্যে একটি ভোজসভার আয়োজন করলো। সে তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিয়ে বললো, ইউসুফ এদের সামনে চলে এসো। যখন তারা তাকে দেখলো, হতভম্ব হয়ে গেল এবং আপন হাত কেটে ফেললো। তারা বললো, কখনই নয়! এ ব্যক্তি মানব নয়। এ তো কোনো মহান ফেরেশতা।'

- সূরা ইউসুফ, ১২:৩১

ইউসুফ (আ.)-কে তাদের সামনে আসতে বলা হয় এবং তাঁর এ আদেশ মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। তারা তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁর সৌন্দর্য দেখছিল এবং ভুলে গিয়েছিল যে, তাদের হাতে ছুরি আছে। ওই নারীরা তাঁর আকৃতি ও রূপ দ্বারা এতটাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, তারা ফল কাটার বদলে নিজেদের হাত কেটে ফেলে এবং তারা ইউসুফ (আ.)-কে ফেরেশতা হিসেবে বর্ণনা দিতে শুরু করে। আত্মবিশ্বাসী ও অহংকারী আজিজের স্ত্রী তাঁর অতিথিদের দিকে উল্লসিত হয়ে বলেন:

قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ
رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ
مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ

'এ তো ওই ব্যক্তি, যার জন্যে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করছিলে। আমি ওরই মন জয় করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে। আর আমি যা আদেশ দেই, সে যদি তা না করে, তবে অবশ্যই সে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে এবং হবে লাঞ্ছিত।'

- সূরা ইউসুফ, ১২:৩২

ইউসুফ (আ.) নিজের পবিত্র তারুণ্যসহ রাজধানীর অভিজাত নারীদের সামনে এমন এক সুন্দর বদনখানা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, যা এই দুনিয়ার সকল সৌন্দর্যকে হার মানায়। এই পরিস্থিতিতে তিনি আল্লাহ তা'আলাকে আহ্বান করেন এবং দু'আ করেন:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي
إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ
إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ

'ইউসুফ বললো, হে (আমার) পালনকর্তা! তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহবান করছে, তাঁর চাইতে আমি কারাগারকেই পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে

প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো
এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো'

- সূরা ইউসুফ, ১২:৩৩

হযরত ইউসুফের (আ.) এই দু'আটির পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে, ইউসুফ (আ.)-কে যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, তাঁর একটি দৃশ্যপট নিজেদের কল্পনাতে ফুটিয়ে তুলতে হবে। কুর'আনের এই আয়াতগুলোর আলোকে দৃশ্যপটটি এরূপ হবে:

বিশ বছরের সুদর্শন যুবক, যিনি জোরপূর্বক দাসত্ব ও নির্বাসনের অগ্নিপরীক্ষা পেরিয়ে যৌবনের স্বাস্থ্য ও তেজ নিয়ে মরুভূমি থেকে মিশরে প্রবেশ করেছেন। ভাগ্য তাকে ওই সময়ের সর্বাধিক সভ্য দেশের রাজধানীর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির বাড়িতে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেয়। ওই পরিবেশে সুদর্শন এই তরুণটি জীবনের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। যে বাড়িতে থাকে থাকতে হবে, সেই বাড়ির নারী গৃহকর্ত্রী প্রেমে পড়ে যায় এবং তাকে প্রলুব্ধ করতে শুরু করে। পরবর্তীতে তাঁর সৌন্দর্যের খ্যাতি পুরো রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং শহরের অন্যান্য অভিজাত নারীও তাঁর সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়। আর এভাবে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠে। লালসার ফাঁদ তাঁর চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। সব ধরনের কৌশল তাঁর আবেগকে উত্তেজিত করতে ব্যবহৃত হচ্ছিল। সে যেখানেই যায় সেখানেই যেন লালসার পাপ তাকে আক্রমণের জন্য ওৎ পেতে আছে। কিন্তু ঈমানদার এই যুবক শয়তানের সৃষ্ট এসব অগ্নিপরীক্ষা সফলতার সাথে পাড়ি দিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের এক উজ্জ্বল নিদর্শন প্রদর্শন করে, যা সত্যই প্রশংসনীয়। তবে এখানে প্রশংসার সবচেয়ে বড় দিকটি হচ্ছে: এমন লালসাময় পরিস্থিতিতে নিজের ঈমানকে অটুট রাখার পাশাপাশি তিনি নিজের ঈমান নিয়ে কোনো ধরনের গর্ব বা আত্ম-অহমিকায় ভেসে যাচ্ছেন না। বরং তিনি বিনীতভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট এই বলে দু'আ করেন যে, হে আমার রব, আমি দুর্বল, আমি আশঙ্কা করি এই প্রলোভনগুলি আমাকে আয়ত্ত করে ফেলতে পারে। আর এমন পাপে জড়ানোর চেয়ে আমি তো জেলখানাকে উত্তম হিসেবে বেছে নেবো। প্রকৃতপক্ষে, এটা ছিল ইউসুফের (আ.) প্রশিক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই অগ্নিপরীক্ষা তাঁর সুপ্ত গুণগুলোকে বের করে আনে,

যেগুলো সম্পর্কে তিনি নিজেও অজ্ঞাত ছিলেন। এরপরই তিনি তিনি বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সততা, বিশ্বস্ততা, ধর্মভীরুতা, দানশীলতা, ন্যায়নিষ্ঠা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, মানসিক ভারসাম্যের মতো উচ্চ গুণাবলী দান করেছেন এবং যখন তিনি মিশরে ক্ষমতা লাভ করেন, তখন তিনি এসব গুণের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন।
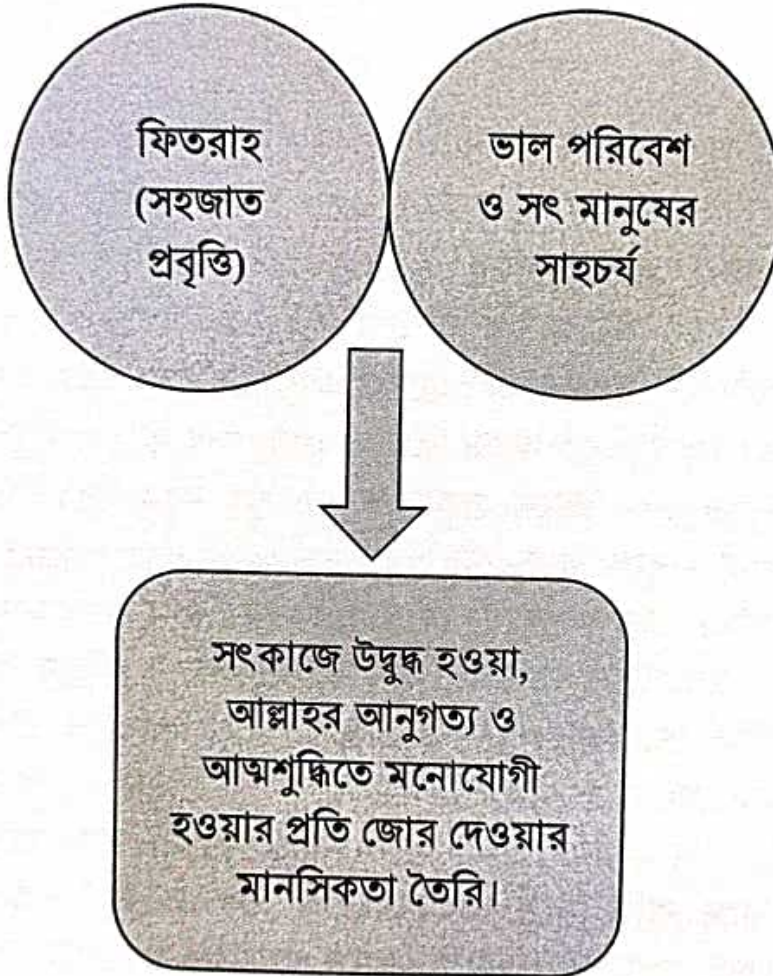
শিক্ষা
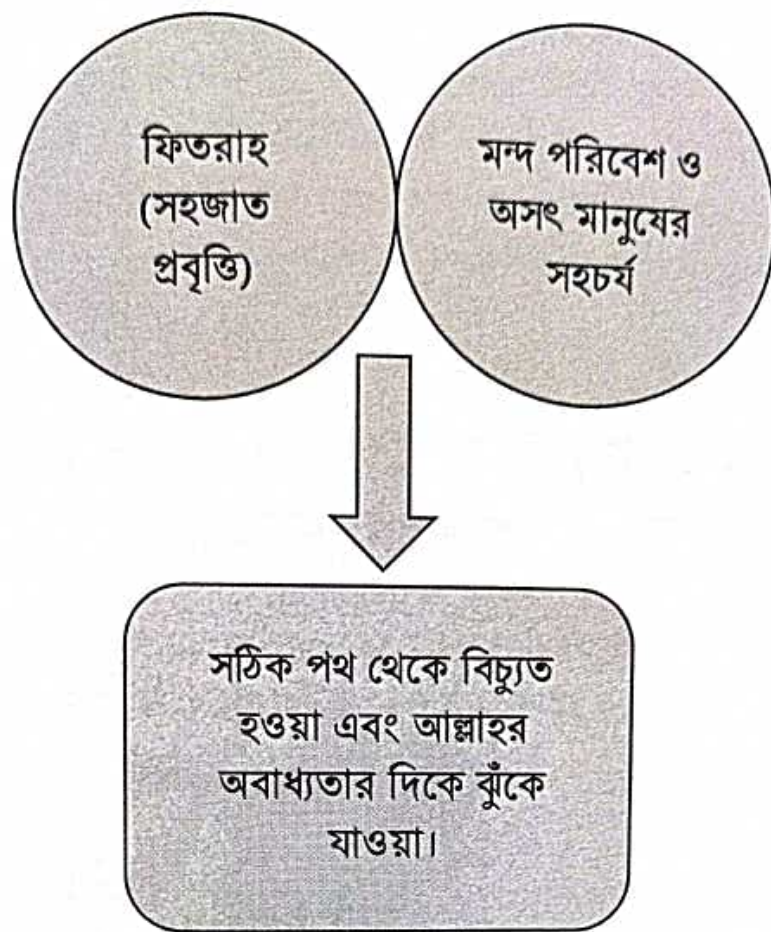
যখন আমরা নিজেদেরকে সঠিক পরিবেশ ও সৎকর্মপরায়ণদের দ্বারা ঘিরে রাখি, তখন আমাদের জন্য এই পথে নিজেদেরকে সমুন্নত রাখাটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, কারণ আমাদেরকে যে দ্বীন তথা ইসলাম দেওয়া হয়েছে, তা মূলত ফিতরাত বা স্বভাব ধর্ম, আর তাই সহজাতভাবেই আমাদের থেকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য চলে আসে। অন্যদিকে আমরা যদি নিজেদেরকে ভুল লোকদের দ্বারা ঘিরে রাখি, তবে আমাদের সহজাত প্রকৃতি দূষিত হয়ে পড়ে। তাই আমাদের জন্য এমন মানুষদের সঙ্গ ত্যাগ করা আবশ্যক, যাদের সঙ্গ আমাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে গাফেল রাখে। আমাদের উচিত এমন মানুষদের আশেপাশে থাকা, যারা আমাদেরকে ফিতরাতের পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে।

ইউসুফ (আ.) জানতেন, তাঁর সকল মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার হাতে এবং কেবল তিনিই তা কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। তিনি নিজের মর্যাদার জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন, বরং তিনি তাঁর ঈমানকে এসব পাপী মানুষের কবল থেকে হেফাজতের বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাই তিনি নিজের ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যের স্বার্থে এমন পরিবেশে থাকার চেয়ে কারাগারে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করেন এবং সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

ইউসুফের (আ.) সাথে পিতা ইয়াকুব (আ.) এবং পরিবারের সদস্যদের পুনর্মিলন

আসুন আমরা ইউসুফ (আ.) এই আরেকটি দু'আ পর্যালোচনা করি, তবে তাঁর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে আমাদেরকে কিছুটা পেছনে ফিরে যেতে হবে।

ইউসুফ (আ.) যেসব পরিস্থিতির পার করছেন, আসুন আমরা সেগুলোর দিকে একটু নজর দিই:
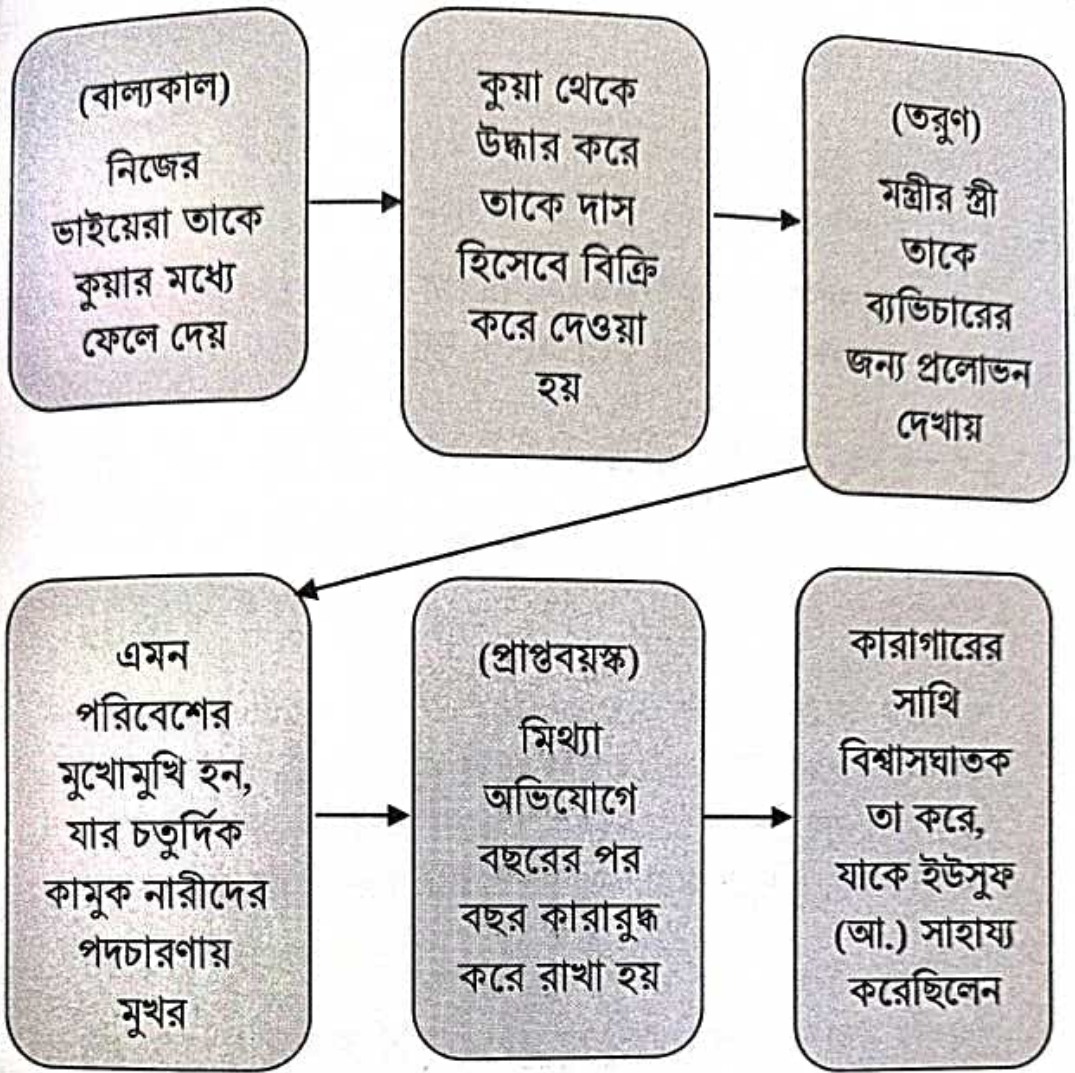
ইউসুফ (আ.) শৈশব থেকে যৌবন অবধি যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যান এবং পিতা ইয়াকুবের (আ.) সাথে পুনরায় মিলিত হওয়ার মাধ্যমে ইউসুফের (আ.) ঘটনাটি একটি সুন্দর পরিণতি লাভ করে। কিন্তু এই পুনর্মিলনের আগে আশ্চর্যজনক কিছু ঘটনা ঘটে, যা এই পুনর্মিলনকে বাস্তবে রূপ দিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইউসুফ (আ.) তাঁর পিতা ও তাঁর পরিবারের সাথে মিলিত হওয়ার পর যে দু'আ করেন, তাঁর প্রকৃত হাকিকত উপলব্ধি করতে হলে আমাদেরকে ওই ঘটনাগুলো জানতে হবে এবং এজন্য একটু পেছনে ফিরে যেতে হবে।

ফিরে দেখা

উপযুক্ত সময়েই ইউসুফ (আ.)-কে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, তবে ওই সময়ে এক অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

মিশরের বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখেন, যা ইউসুফ (আ.)-কে পুরো সম্মান ও মর্যাদার সাথে জেল থেকে বের করে আনার মূল কারণ হয়ে ওঠে:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ

'বাদশাহ বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভী, এদেরকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক। হে পরিষদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলো, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাকো।'

- সূরা ইউসুফ, ১২:৪৩

বাদশার সভাসদরা বাদশাহর মতোই হতবাক হয়ে যায় এবং এই স্বপ্নকে কল্পনাপ্রসূত আখ্যা দিয়ে তারা বলে, এই স্বপ্ন ব্যাখ্যার উপযোগী নয় - সূরা ইউসুফ, ১২:৪৪

ইউসুফের (আ.) সাথে কারাগারে ছিল এমন এক মদ-পরিবেশক যখন বাদশাহর এমন স্বপ্নের কথা শুনে, তখন তাঁর মনে ইউসুফের (আ.) কথা ভেসে ওঠে, যেহেতু কারাগারে বহু বছর আগে ইউসুফ (আ.) একবার এই লোকের দেখা স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। এই নিজে থেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে এগিয়ে আসে এবং বলে তাকে যেন ইউসুফের (আ.) কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

লোকটি কারাগারে ফিরে আসেন এবং ইউসুফের (আ.) কাছে স্বপ্নটির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে এর ব্যাখ্যা দিতে অনুরোধ করেন, যাতে তিনি দরবারের লোকদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানাতে পারেন। (সূরা ইউসুফ, ১২:৪৬)

ইউসুফের (আ.) দেওয়া ব্যাখ্যা যে সঠিক, তা বাদশাহ ও তাঁর পরিষদ বুঝতে সক্ষম হয় এবং একই সাথে ইউসুফ (আ.)-কে অন্যায়ভাবে বন্দী করা যে কতটা ভুল ছিল, তা তারা উপলব্ধি করে। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের বদৌলতেই ইউসুফ (আ.) বাদশাহের দেখা এই স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন।

ইউসুফের (আ.) দ্বারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ

'ইউসুফ বললো, তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতপর যা কাটবে, তাঁর মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে, তা ছাড়া অবশিষ্ট শস্য শীষসমেত রেখে দেবে। এবং এরপরে আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর; তোমরা এ দিনের জন্যে যা রেখেছিলে, তা খেয়ে যাবে, কিন্তু অল্প পরিমাণ ব্যতীত, যা তোমরা তুলে রাখবে। এর পরেই আসবে একবছর, এতে মানুষের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং এতে তারা রস নিঙড়াবে (জলপাই ও আঙ্গুর)।'

- সূরা ইউসুফ, ১২:৪৭-৪৯

ইউসুফের (আ.) ক্ষমতা লাভ

বাদশাহ ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হন। তিনি ইউসুফ (আ.)-কে তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে আনার নির্দেশ দেন। তৎক্ষণাৎ ইউসুফ (আ.)-কে কারাগার থেকে বের করে আনা হয়, কিন্তু এতে ইউসুফের (আ.) একটি শর্ত ছিল।

কারাগার থেকে মুক্ত করতে আসা দূতের সাথে ইউসুফ (আ.) যে ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখান, তা বাদশাহর জন্য অপ্রত্যাশিত ছিল। ইউসুফ (আ.) কারাগার ছেড়ে যেতে অস্বীকৃতি জানান, যতক্ষণ না তাঁর ও ওইসব অভিজাত নারীর সাথে যে ঘটনাটি ঘটেছিল, তাঁর মীমাংসা না করা হচ্ছে।

মুক্তিলাভের আগে ইউসুফের (আ.) নিকট দু'টো বিষয় প্রতিষ্ঠিত করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমত, মন্ত্রীর স্ত্রী ও তাঁর সহযোগী নারীদের সাথে ঘটা বিষয়টি পরিষ্কার করে নিজেকে নির্দোষ হিসেবে প্রমাণ করা। দ্বিতীয়ত, ইউসুফের (আ.) জন্য এমন আশ্বাসের প্রয়োজন ছিল যে, কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি আর কখনো এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন না। যেকোনো একটি কিংবা উভয় শর্ত পূরণ না হলে তিনি কারাগারে থাকাকেই পছন্দ করবেন।

ইউসুফ (আ.) বিনয়ের সাথে নারীঘটিত বিষয়টির তদন্ত করতে বলেন। বাদশাহ বেশ কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এবং আল-আজিজ তথা মন্ত্রীর স্ত্রী ও তাঁর সহযোগীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠান।

ওই নারীরা সবকিছু স্বীকার করে নেয় এবং ইউসুফ (আ.) যে নির্দোষ ছিলেন, তা অকপটে মেনে নেয়।

অর্থমন্ত্রী হিসেবে ইউসুফ (আ.)

ইউসুফ (আ.) বাদশাহর কাছে অনুরোধ করেন যে, তাকে যেন রাজ্যের ভাঁড়ারগুলির অভিভাবক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তাঁর অনুরোধ মঞ্জুর হয় এবং এভাবে ইউসুফ (আ.)-কে মিশরের অর্থমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান। ইউসুফ (আ.) স্বীয় প্রতিপালকের বাণী প্রচার করতে থাকেন এবং আল্লাহর আদেশে ন্যায়বিচার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম ৭ বছরে জনগণের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি তিনি প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য জমা করতে থাকেন।

যে ছেলেকে বিশ্বাসঘাতকতা করে কুয়াতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, আজ সেই কিনা মিশরের অর্থমন্ত্রী। ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং সর্বোপরি আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করার মাধ্যমেই তিনি এমন বড় পুরস্কার লাভ করতে সক্ষম হন। ইউসুফ (আ.) এটা ভালো করেই জানতেন যে, ধৈর্য ও তাকওয়া বা আল্লাহভীতির প্রকৃত প্রতিদান আখিরাতে পাওয়া যাবে।

পরিবারের সাথে পুনর্মিলন

সময় অতিবাহিত হতে থাকে, সুজলা-সুফলা সাত বছর পেরিয়ে আসে দুর্ভিক্ষ-খরার সাত বছর। প্রথম সাত বছর তিনি অত্যন্ত সফলভাবে খাদ্যশস্য মজুদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার ফলে তিনি অত্যন্ত সুচারুভাবেই দুর্ভিক্ষকে মোকাবিলা করতে পারছিলেন। যারাই তাঁর কাছে খাদ্য সহায়তার জন্য আসতো, তিনি তাদের মধ্যে সঞ্চিত শস্য বিতরণ করতেন।

দুর্ভিক্ষের কারণে আশেপাশের অঞ্চলগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফিলিস্তিন ও তাঁর নিকটস্থ এলাকাগুলোও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। ফলশ্রুতিতে ইয়াকুবের (আ.) পরিবারও খাদ্যাভাবের মুখোমুখি হয়। তারা শুনতে পায় যে, মিশরের অর্থমন্ত্রী জিনিসপত্রের বিনিময়ে খাবার দান করছেন। সে মোতাবেক বৃদ্ধ ইয়াকুব (আ.) তাঁর ছেলেদেরকে খাবার কিনতে মিশরে পাঠান।

ভাইয়েরা যখন মিশরে পৌঁছায় এবং খাবার সংগ্রহের জন্য ইউসুফের (আ.) কাছে যায়, তখনই তিনি তাদেরকে চিনতে পারেন। কিন্তু কুয়াতে ফেলে দেওয়ার পর যেহেতু তারা আর তাকে দেখেনি, তাই তারা আর ইউসুফ (আ.)-কে চিনতে পারেনি। তারা কিভাবে জানবে যে, যে ভাই তারা কুয়াতে ফেলে দিয়েছিল, আজ সেই ভাইটিই মিশরের অর্থমন্ত্রী?

এভাবে ইউসুফ (আ.) নিজের প্রজ্ঞার মাধ্যমে তাঁর ভাইদের দ্বারা নিজের পিতা ইয়াকুব (আ.)-কে প্রাসাদে নিয়ে আসেন এবং এর মাধ্যমে তিনি শেষমেশ তাঁর প্রিয় পিতার সাথে পুনরায় মিলিত হন।

ইউসুফের (আ.) পরিবারের সকলে ফিলিস্তিন থেকে মিশরের দিকে যাত্রা করে এবং ইয়াকুবের (আ.) পরিবার যখন মিশরের কাছাকাছি পৌঁছায়, তখন ইউসুফ (আ.) তাঁর পিতামাতাকে রাজকীয় সম্মানের সাথে গ্রহণ করতে বেরিয়ে পড়েন, আর তখন তাঁর সাথে ছিল রাজা ও সভাসদবর্গ:

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَـٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا

'এবং তিনি পিতামাতাকে সিংহাসনের উপর বসালেন এবং তারা সবাই তাঁর সামনে সেজদাবনত হল। এবং তিনি বললেন, (হে আমার) পিতা, এ হচ্ছে আমার ইতিপূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আমার পালনকর্তা যেটাকে সত্যে পরিণত করেছেন।'

- সূরা ইউসুফ, ১২:৪৭-৪৯

ইউসুফের (আ.) সুন্দর দু'আ (৬ অংশে একটি দু'আ)

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ

'হে পালনকর্তা, আপনি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছেন'

- আল্লাহ ইউসুফ (আ.)-কে নিজের জীবন এবং অন্যদের উপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দান করলেন।

وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ

এবং আমাকে বিভিন্ন জিনিসের তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করার বিদ্যা শিখিয়েছেন

- আল্লাহ ইউসুফ (আ.)-কে বক্তব্য ও স্বপ্ন ব্যাখ্যার শক্তি দান করেছিলেন।

- আল্লাহ তা'আলা একক, কেবলমাত্র তিনিই পারেন ক্ষমতা ও অলৌকিকতা দান করতে।

- আল্লাহ সর্বদা ইউসুফের (আ.) সাথে আছেন।

- ইউসুফ (আ.) আল্লাহর কাছে বিনীত দাস হয়ে মৃত্যুবরণ করার জন্য আকুল আবেদন করেন।

- দ্বিতীয় দু'আ, আখিরাতে ধার্মিক লোকদের সাথে থাকার জন্য।

দু'আর গূঢ় মর্ম উপলব্ধি করা

এই দু'আ থেকে শিক্ষা নিতে আমরা একে ৬-টি ভাগে বিভক্ত করেছি। আসুন এখন দু'আর গভীরতা এবং এর থেকে কি কি বিষয় শিক্ষা নেওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনা করি,

দু'আর প্রথম অংশ: হে পালনকর্তা, আপনি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছেন

শিশু হিসেবে ইউসুফের (আ.) নিজের জীবনের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং যে ভাইয়েরা তাকে কুয়াতে ফেলে দিয়েছিল, তাদের উপর তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কে তাকে কুয়া থেকে উদ্ধার করবে, তাঁর ব্যাপারেও তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। যখন তাকে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়, তখনও এ বিষয়ের উপর তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এরপর মন্ত্রীর বাড়িতে এবং কামুক নারীদের কলাকৌশলের উপরও তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আবার যখন তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, তখনও পরিস্থিতি তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল না। তাঁর জীবনে ঘটে জিনিসগুলোর উপর তাঁর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর জীবনের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ দান করেন এবং তাকে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দান করেন। ইউসুফ (আ.) দু'আতে নিজের শক্তিহীন থাকার বিষয়টি উল্লেখ না করে এটা স্বীকার করে নেন যে, শক্তিহীন থাকা এবং বহু বছর কষ্টে কাটানোর পর আল্লাহ তাকে যে সম্মান ও আভিজাত্য দান করেছেন, তিনি তাঁর পেছনে থাকা প্রজ্ঞাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

শিক্ষা

ইউসুফ (আ.) বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোনো অভিযোগ আনেননি, আর না তিনি এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি আল্লাহকে এই বলে প্রশ্ন করেননি যে, 'আমি এর প্রাপ্য নই, কেন আমাকে এমন পরিস্থিতিতে রাখলেন?' প্রায়শই আমরা যখন কোনো সমস্যার মুখোমুখি হই এবং পরবর্তীতে আল্লাহ যখন আমাদেরকে ওই সমস্যা থেকে উদ্ধার করেন, তখন আমরা যে সমস্যায় ছিলাম তা বেমালুম ভুলে যাই এবং স্বীকার করি না যে, আল্লাহই আমাদেরকে শক্তি দিয়ে ওই সমস্যা থেকে উদ্ধার করেছেন, আবার চাইলে তিনি আমাদেরকে ওই পরিস্থিতি কিংবা তাঁর চেয়ে কঠিনতর পরিস্থিতি ফেলতে পারেন। উপরন্তু, আমাদের জীবনে ঘটা যাবতীয় দুঃখকষ্ট, যেগুলো আমাদেরকে সুন্দর কিছু উপহার দেয়, সেগুলোর পেছনে যে প্রজ্ঞা রয়েছে, তা আমরা দেখতে ব্যর্থ হই।

একজন পিতা ইয়াকুব (আ.) তাঁর পুত্র ইউসুফ (আ.)-কে হারান, যার কারণে তিনি চরম কষ্টে ভোগেন, কিন্তু তিনি যদি তাঁর পুত্রকে না হারাতেন, তবে মিশরের গোটা জাতি অনাহারে আহাজারি করতো এবং অগণিত মৃত শিশুর জন্য কান্না করতো। ওই একটি শিশুটি বহু কষ্ট ভোগ করে নানা ঘটনার চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে রাজপ্রাসাদে পৌঁছান এবং বাদশাহের দেখা আজব স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি তাঁর নিজ পিতা ইয়াকুব (আ.) ও তাঁর পরিবারসহ হাজার হাজার মানুষের জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হন। ইউসুফের (আ.) জীবনে যদি এসব না ঘটতো, তবে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সাথে হাজারো বিপদগ্রস্ত মানুষের জীবনে এমন 'খায়ের' বা কল্যাণ আসতো না। আল্লাহ কুর'আনে বলেন:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

'এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন গোটা
মানবজাতির জীবন রক্ষা করে।'

- সূরা মায়িদাহ, ৫:৩২

দু'আর দ্বিতীয় অংশ: এবং আমাকে বিভিন্ন জিনিসের তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করার বিদ্যা শিখিয়েছেন

আল্লাহ ইউসুফ (আ.)-কে বক্তব্য ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে শিখিয়েছিলেন। তিনি জানেন, আল্লাহই তাকে এসব শিখিয়েছেন এবং আল্লাহ ব্যতীত তিনি এসব জিনিসের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা রাখেন না। ইউসুফ (আ.) বাদশাহর দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারায় তিনি প্রাসাদে আস্থা ও উচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের পিতা আদম (আ.)-কে সমস্ত ভাষা ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিয়েছিলেন যেমনটি আমরা কুর'আন থেকে জেনেছি।

ইউসুফ (আ.) জাতির জন্য যা কিছু করেছিলেন, তাঁর জন্য তিনি নিজে কোনো কৃতিত্ব গ্রহণ না করে তিনি অকপটে স্বীকার করে নিলেন যে, এসবের পেছনে আল্লাহই ছিলেন এবং কেবল তাঁর সাহায্যেই উপহার হিসেবে তাকে যেসব ক্ষমতা বা বিশেষ গুণ প্রদান করা হয়েছে, সেগুলোর উপযুক্ত ব্যবহার তিনি করতে পেরেছিলেন। ইউসুফ (আ.)-কে প্রদান করা আরেকটি উপহার ছিল সৌন্দর্য। নির্ধারিত অধ্যায়ে আমরা যেমনটি দেখেছি যে, মুসার (আ.) জন্য শক্তি ও ক্ষমতা নানা অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, ঠিক তেমনি ইউসুফের (আ.) সৌন্দর্য লম্পট নারীদেরকে আকৃষ্ট করে তাকে বড় ধরনের অসুবিধার মুখোমুখি দাঁড় করায়। কখনও কখনও যেটাকে আমরা নিজের জন্য সুবিধা ভাবি, প্রকৃতপক্ষে তা আমাদের জন্য অসুবিধার কারণে পরিণত হয়। ইউসুফ (আ.)-কে বক্তব্য ও স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার যে বিশেষ ক্ষমতা বা গুণ প্রদান করা হয়েছিল, তিনি সেটাকে আল্লাহ প্রদত্ত দান বা অনুগ্রহ হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং একইসাথে সর্বোত্তম উপায়ে সে ক্ষমতাকে আশেপাশের মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করেন।

শিক্ষা

অন্যদিকে আমরা যদি নিজেদেরকে এমন কোনো অবস্থানে আবিষ্কার করি, যেখানে আমরা কিছু অর্জন করেছি, তবে আমাদের প্রথম ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হবে ওই অর্জনের জন্য নিজের কৃতিত্ব নেওয়া। আমরা গর্ব করতে শুরু করি এবং সবাইকে এটা দেখাতে আরম্ভ করে দিই যে, কেবল 'আমার' কারণেই ওই সমস্যাটির সমাধান হয়েছে কিংবা অমুক ধারণাটির জন্ম হয়েছে। এটা ডিগ্রি অর্জন করা, সমস্যার সমাধান করা, লক্ষ্য অর্জন করা, গন্তব্যে পৌঁছানো কিংবা জীবনের যেকোনো অর্জনই হোক না কেন, আমরা এটার স্বীকার দিতে ভুলে যাই যে, এসব কেবল আমার জন্য হয়নি, বরং এসবের পেছনে সত্যিকার কৃতিত্বের দাবিদার একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

কুর'আনে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّـهُ

' লেখক যেন লিখতে অস্বীকৃতি না জানায়। আল্লাহ তাকে যেমন শিখিয়েছেন, তাঁর উচিত তা লিখে দেওয়া।'

- সূরা বাকারাহ, ২:২৮২

যখন আল্লাহ নিজেই এর কৃতিত্ব নিচ্ছেন যে, তিনিই আমাদেরকে কিভাবে লিখতে হয়, তা শিখিয়েছিলেন, তখন কিভাবে আমরা এই চিন্তা করতে পারি যে, যে কলম দিয়ে আমরা লিখছি, তাঁর শক্তি আমাদের?

আল্লাহই আমাদেরকে এসব করার অনুমতি ও সামর্থ্য দিয়েছেন এবং তিনিই আমাদের পড়তে, লিখতে ও বোঝার ক্ষমতা দান করেছেন। তাই আমরা জীবনে যা কিছুই করি না কেন, আমাদের জন্য আব্যশক হচ্ছে: তাঁর জন্য আল্লাহ তা'আলাকে কৃতিত্ব প্রদান করা।

দু'আর তৃতীয় অংশ: হে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা

ইউসুফ (আ.) এই কথা বলে এই স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে, আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলাই সমস্ত আধিপত্যের মালিক, তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই একক সত্তা, সবকিছুই যাঁর অধীন। যে মুহূর্তে তিনি উচ্চ মর্যাদায় আসীন হলেন এবং রাজপ্রাসাদে নিজের অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করলেন, ঠিক সে সময় তিনি তিনি এই ঘোষণা দিচ্ছেন যে, তিনি আল্লাহর অনুগত বান্দা ছাড়া আর কিছুই নন। আল্লাহই ইউসুফ (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তাকে যাবতীয় উপহার ও অনুগ্রহ দান করেছেন। তিনিই তাকে শান-শওকত দান করেছেন এবং তিনিই তাকে তাঁর প্রিয় পিতা ও তাঁর পরিবারের সাথে আবার একত্র করেছেন। ইউসুফ (আ.) এটা অবগত যে, শক্তি কেবল আল্লাহ তা'আলার এবং তাঁর সাহায্য ছাড়া তিনি জীবনে যা কিছু লাভ করেছেন, তাঁর কিছুই সম্ভবপর ছিল না।

শিক্ষা

আমাদেরকে সর্বদা এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এই পৃথিবী আল্লাহর, পুরো জগৎ আল্লাহর। শক্তি-ক্ষমতা আল্লাহর এবং আমাদের জীবনের যা কিছু ঘটে, তাঁর সবই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে ঘটে। আল্লাহই আমাদেরকে রিজিক দেন, অনুগ্রহ করেন, বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন এবং দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা সিক্ত করেন। আমরা যে পরিস্থিতিতেই থাকি না কেন, আমাদেরকে এটার স্বীকৃতি দেওয়া আবশ্যক যে, আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের রব (পালনকর্তা) এবং আমরা তাঁর দাস। আল্লাহ শক্তির মদদ ছাড়া আমরা শক্তিহীন এবং তাঁর রহমত ও অনুমতি ছাড়া আমরা এক ইঞ্চি পরিমাণও নড়তে পারি না। এই বিশ্বাস আমাদেরকে বিনয়ী করে তোলে এবং আমাদের মর্যাদাকে উপলব্ধি করে তোলে, আমাদের আমাদের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধিতে সহায়তা করে এবং একইসাথে আমাদেরকে সব অহংকার, দম্ভ ও আত্মগরিমা থেকে মুক্ত রাখে।

দু'আর চতুর্থ অংশ: আপনিই আমার অভিভাবক ইহকাল ও পরকালে

ওয়ালি (অভিভাবক)-এর গুণাগুণ:

দু'আর এই অংশটি খুবই চমৎকার, কারণ ইউসুফ (আ.) ভালো করেই জানেন যে, একেবারে ছোটবেলাতেই যখন তাকে অন্ধকার কুয়াতে ফেলে দেওয়া হয়, তখনও তিনি একা ছিলেন না, কারণ তাঁর ওয়ালি (অভিভাবক) আল্লাহ তাঁর সাথেই ছিলেন। মন্ত্রীর স্ত্রী যখন তাকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছিল এবং এর জের ধরে তাকে অন্যায়ভাবে কারাগারে বন্দী করা হয়, ঠিক তখনও আল্লাহ

তা'আলা তাঁর সাথে ছিলেন। আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে রক্ষা করেন, সুরক্ষা দেন, পথ-নির্দেশনা দেন এবং ইউসুফ (আ.) যেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে পৌছাতে পারেন, তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করেন। ইউসুফ (আ.) স্বীকার করছেন যে, বাহ্যিক পরিস্থিতি যতই খারাপ মনে হোক না কেন, আল্লাহ তা'আলা সর্বদা তাঁর সাথেই ছিলেন এবং তাকে রক্ষা করে আসছিলেন।

শিক্ষা

আমাদের জীবনে আমরা এমন অধ্যায় পার করি, যখন আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকি। আমরা এতটা বেদনা ও কষ্টে আক্রান্ত থাকি যে, আমরা ভাবতে থাকি যদি কবে এই অন্ধকার পার করে একগুচ্ছ আলোর দেখা পাবো। আর ঠিক এমন মুহূর্তে আমাদেরকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, পরিস্থিতি আপাত দৃষ্টিতে যতই অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হোক না কেন, (আমাদেরকে উদ্ধারের জন্য) আল্লাহ সর্বদা আমাদের সাথে আছেন। তিনিই আমাদের ওয়ালি তথা অভিভাবক এবং সংকটের মুহূর্তে তিনি কখনো আমাদের একা ফেলে আসেন না। যখন আমরা এমনটি করি, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের অন্তর প্রশান্ত হয়ে পড়ে। কেননা, আমরা দৃঢ়ভাবে জানি যে, আল্লাহর ইচ্ছায় এই অন্ধকার কেটে যাবে এবং শীঘ্রই আমরা আলোর দেখা পাবো।

আল্লাহ তা'আলা কুর'আনে বলেন:

اللَّـهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

'যারা ঈমানদার, তাদের অভিভাবক আল্লাহ। তাদেরকে তিনি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন।'

- সূরা বাকারাহ, ২:২৮২

বিশ্বজাহানের রব নিজেই যখন ঘোষণা দিচ্ছেন যে, ঈমানদারদেরকে তিনি অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন, তখন তাঁর দেওয়া এই প্রতিশ্রুতিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হওয়া হওয়া কথা। তাই আমাদের উচিত হবে আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখা এবং নিজেদের বিষয়গুলো আল্লাহর হাতে সমর্পণ করে তাঁর দৃষ্টিতে ভাল মুমিন হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা।

দু'আর পঞ্চম অংশ: আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যুদান করুন

মিশরের অর্থমন্ত্রী হওয়ার সুবাদে এখন ইউসুফের (আ.) সব রয়েছে। তিনি ক্ষমতা, মর্যাদা ও আভিজাত্য পেয়েছেন, পুনরায় মিলিত হয়েছেন প্রিয় পিতা ও পরিবারের সাথে। তাঁর এখন আর কি চাওয়া থাকতে পারে?

কিন্তু তিনি আল্লাহর কাছে ঈমানদার হিসেবে মৃত্যুবরণ করার আর্জি পেশ করলেন। যখন সবকিছু স্বাভাবিক হতে থাকে, পরিস্থিতি অনুকূলে আসতে শুরু করে, তখন আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়াটা আমাদের জন্য বেশ সহজ হয়ে পড়ে। বিষয়টি ইউসুফ (আ.) বুঝতে পারেন, তাই তিনি এই আন্তরিক দু'আটি করেন, যেখানে তিনি চেয়েছেন ঈমানদার হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে।

শিক্ষা

যখন সময় ভাল হতে থাকে, প্রায়শই আমরা তখন আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকি। আমরা আল্লাহকে ভুলে নিজেদের জীবন সংগ্রামে মগ্ন হয়ে পড়ি। অন্ধকারকে দূরে হটিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে যে আলোর সন্ধান দিয়েছেন এবং আমাদের উপর তিনি প্রতিনিয়ত যে রহমত ও করুণা বর্ষণ করে যাচ্ছেন, তা ভুলে আমাদের জন্য চরম অকৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর সাহায্য ও করুণার দ্বারাই আমরা আমাদের জীবনের সকল প্রতিবন্ধকতা পার করি। ইউসুফ (আ.) ওইসব লোকের মতো হতে চাননি, যারা অকৃতজ্ঞ এবং সুসময়ে আল্লাহকে ভুলে যায়। পরিশেষে, আমরা যদি ঈমানদার হিসেবে আল্লাহর নিকট পৌঁছাতে না পারি, তবে আমরা যত অর্জনই করি না কেন, তা মূল্যহীন। আমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য এটা নিশ্চিত করতে হবে, আমরা নিজেদেরকে সর্বদা আল্লাহর প্রতি বিনয়ী ও অনুগত রাখছি, কেননা আমাদের যা কিছুই আছে এবং আমরা এখন যে অবস্থায় আছি, তাঁর পেছনে রয়েছে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলার ভালবাসা ও রহমত।

দু'আর ষষ্ঠ অংশ: এবং শেষ পর্যন্ত আমাকে সৎকর্মীদের সাথে মিলিত করুন

বেশিরভাগ নবী এবং তাদের অনুগত সাহাবিগণ পাপাচারে পূর্ণ পরিবেশ ও মন্দ লোকদের দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন। ইউসুফ (আ.)-ও শৈশব থেকেই একই অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেছেন। তাকে নিয়ে তাঁর ভাইয়েরা হিংসা করতো এবং ষড়যন্ত্র করে তারা তাকে কুয়াতে ফেলে দেয়। এরপর একদল লোক তাকে উদ্ধার করে এবং নিজেদের লাভের কথা ভেবে তাকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। অতপর তিনি তিনি মন্ত্রীর গৃহে আশ্রয় পান এবং সেখানে মন্ত্রীর স্ত্রীর তাকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা চালায়। কিন্তু সুবিধা করতে না পেরে সে শহরের অভিজাত নারীদের ডেকে এনে পরিস্থিতিকে আর কঠিন করার চেষ্টা করে। যার ফলে ইউসুফ (আ.) কারাগারে পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হন। কিন্তু ইউসুফ (আ.) ভালোভাবেই অবগত ছিলেন যে, এসবই আল্লাহর পরিকল্পনা। আল্লাহ বিনা কারণে তাকে এমন মন্দ পরিবেশ ও নোংরা মানসিকতার মানুষদের দ্বারা বেষ্টিত করেননি। বরং এসবই ছিল তাঁর জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। তিনি দেখতে চান কিভাবে আপনি আপনার সেরাটা বের করে এমন পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন এবং সবর তথা ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে জীবনে সত্য ও ন্যায়কে ধারণ করেন।

কিন্তু ইউসুফ (আ.) মৃত্যুর পরের জীবনে শুধু নেক ও সৎ লোকদের সাথে পুনরুত্থিত হতে চেয়েছেন। তিনি জানতেন, পৃথিবীতে তাঁর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য খারাপ পরিবেশে থাকা অসুবিধাজনক নয়, যদি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ন্যায় ও সত্যের আলো সবদিকে ছড়িয়ে দেওয়া সুবিধা।

শিক্ষা

সূরা আন-নূরে ঈমানদার ব্যক্তিকে আলোকবর্তিকার সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাই আমাদের জন্য আদর্শ হচ্ছে এমন ব্যক্তি হওয়া, যে কিনা অন্ধকার পরিবেশে আলো ছড়িয়ে দেবে। আশেপাশের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়াটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আল্লাহ যদি আমাদেরকে কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে নির্দিষ্ট লোকেদের সাথে রেখে দেন, তবে উপলব্ধি করতে হবে যে, এর পেছনে আল্লাহর কোনো না কোনো পরিকল্পনা রয়েছে। আমাদের দায়িত্ব হবে সত্য ও ন্যায়কে ধারণ করা এবং নিজেদেরকে ওই আলোকবর্তিকায় রূপান্তরিত করা, যা অন্ধকারে আলো ছড়াবে।

নবী আইয়ুবের (আ.) দু'আ

নবী আইয়ুব (আ.) আল্লাহর একনিষ্ঠ ইবাদাতগুজার বান্দা ছিলেন। তাঁর ঘটনাতে অনেক শিক্ষা খুঁজে পাই, যা আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ককে মূল্যায়ন করতে আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে। তাঁর ঘটনা আমাদেরকে এই প্রশ্নের মুখোমুখি করায় যে, আল্লাহর জন্য আমাদের যাবতীয় আন্তরিকতা ও ইবাদাত কি শুধু তাঁর অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভের উপর নির্ভরশীল কিনা!

বর্ণিত আছে, আইয়ুব (আ.) দামেস্কের নিকটবর্তী শাম অঞ্চলে বসবাস করতেন। আল্লাহ তাকে বিপুল সম্পদ দান করেছিলেন। তাঁর ছিল জমি, গবাদি পশু, দাসদাসী এবং তাঁর অনুগত পরিবার। সবকিছু মিলিয়ে তিনি অত্যন্ত পরহেজগার ছিলেন। প্রতিনিয়ত তিনি স্বীয় রবের শুকরিয়া আদায় করতেন এবং তাঁর প্রশংসায় দিন পার করতেন।

অতপর আল্লাহ তাকে নানা ধরনের বিপর্যয় দিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। কুর'আনের তাফসিরবিদদের মতে, আল্লাহ সর্বপ্রথম আইয়ুবের (আ.) সমস্ত সম্পদ হঠাৎ কেড়ে নিয়ে পরীক্ষায় ফেলেন। কিন্তু আইয়ুব (আ.) ছিলেন দৃঢ় ও অবিচল। না তিনি এই বিপর্যয়ে ভেঙ্গে পড়েছেন, আর না তিনি পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতায় স্তব্ধ হয়েছেন। বরং তিনি তাঁর আগের মতো স্বীয় প্রতিপালকের গুণগান গেয়ে যেতে থাকেন।

আল্লাহ তখন আইয়ুবের (আ.) সন্তানদের জীবন একে একে কেড়ে নিতে শুরু করলেন। কিন্তু এটাও তাঁর অবস্থাতে পরিবর্তন আনেননি, বরং তিনি আপন রবের আনুগত্যে আগের মতোই নিষ্ঠাবান থাকেন। এরপর আল্লাহ তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাতে শুরু করলেন, যা তাকে ভয়ানক যন্ত্রণা ও কষ্টে পতিত করে। রোগের ভয়াবহতায় মানুষজন তাকে ছেড়ে চলে যেতে থাকে, কিন্তু আইয়ুবের (আ.) ঈমান ও আনুগত্যে বিন্দু পরিমাণ ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়নি, বরং তাঁর অন্তর আরও বেশি করে আল্লাহর দিকে ধাবিত হতে থাকে।

বর্ণিত আছে, ওই সময় পৃথিবীতে এমন কেউ ছিল না, যিনি আইয়ুব (আ.) অপেক্ষা আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্মানিত ছিলেন।

আইয়ুবের (আ.) রোগ দিন দিন এতটাই প্রকট হতে থাকে যে, তাঁর কাছের মানুষরা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে। কেউ তাঁর সাথে দেখা করতে চাইতো না। তাকে শহর থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং লোকজন তাকে সম্পূর্ণরূপে বয়কট করে। তাঁর স্ত্রী ছাড়া তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল কেউ ছিল না। তিনি তাঁর সেবাযত্ন চালিয়ে যেতে থাকেন। মূলত অসুস্থ হওয়ার আগে আইয়ুব (আ.) তাকে যেভাবে ভালোবাসতেন ও খেয়াল রাখতেন, তা স্মরণ রেখে তিনি তাঁর স্বামীর সাথে থেকে যান।
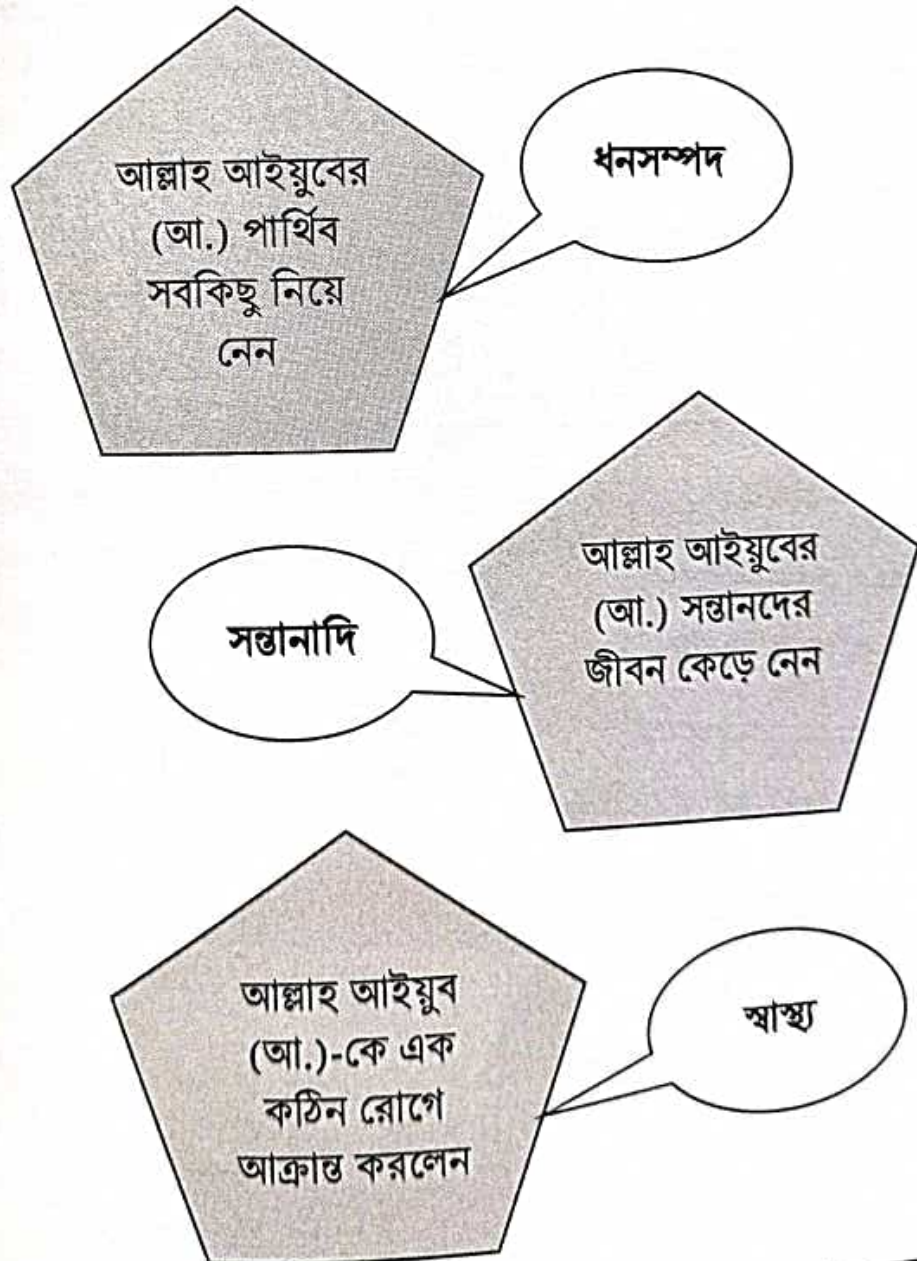
আইয়ুব (আ.) ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আমরা প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানতে পারি, ওই সময় যদি কেউ এমন রোগে আক্রান্ত হতো, যার চিকিৎসা সম্পর্কে কেউ অবগত নয়, তখন তাদেরকে সবার থেকে আলাদা করে দেওয়া হতো, যাতে রোগটি আশেপাশে ছড়িয়ে না পড়ে। এ কারণে আইয়ুব (আ.)-কে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। তিনি তাঁর সবকিছু হারান, খামার, বাড়ি, সহায়-সম্পদ থেকে শুরু নিজের সন্তাননাদি ও নিজের স্বাস্থ্য। তাঁর পাশে শুধু তাঁর অনুগত স্ত্রীই ছিল, যিনি এমন অসুস্থতার সময়টিতেও তাঁর প্রিয় স্বামীকে একা না ফেলে সেবা-শুশ্রূষা করতে থাকেন।

সূরা আল-আম্বিয়াতে আইয়ুবের (আ.) বিষয়টি উল্লেখের আগে আল্লাহ তা'আলা নবী সুলাইমানের (আ.) ঘটনাটি তুলে ধরেন, যা আমাদেরকে উভয় নবীর মাঝে একটা তুলনা টানতে সাহায্য করে।

আইয়ুব (আ.) তাঁর স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। আমরা যদি আমাদের কোনো একটি ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলি, তবে আমরা তো নিজেদেরকে একেবারে অসহায় ও অস্তিত্বহীন ভাবতে শুরু করি। মানুষ হিসেবে আমরা অন্যসব প্রাণী চেয়ে আলাদা। উৎপাদনশীলতা হারিয়ে গেলে আমাদের মাঝে কিছু একটা নেই, এমন অনুভূতি স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে। অসুস্থতার কারণে আমরা যদি কিছু করতে না পারি, তবে তা আমাদের মাঝে এক ধরনের নেতিবাচক অনুভূতির জন্ম দেয়, যা অনেক ক্ষেত্রে আমাদেরকে হতাশাবাদী মানুষে পরিণত করতে পারে।

যখন আপনি মানসিকভাবে তলানীতে থাকেন, তখন আপনি ভাবতে শুরু করেন যে, কেউই আপনার কথা ভাবে না। যেহেতু আপনি আর কারও কোনো প্রয়োজনে লাগছেন না, সেহেতু সকলে আনপার থেকে দূরত্ব বজায় রাখছে। এমনকি আপনি চিন্তা করতে শুরু করেন যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও আপনাকে পরিত্যাগ করেছেন। যেহেতু আপনি দুনিয়ার কোনো কাজে আসছেন না, সেহেতু আপনি আল্লাহর দৃষ্টিতে অর্থহীন একজন। কেননা, আপনি যদি কারও কোনো কাজে আসতেন, তবে আল্লাহ আপনাকে দিয়ে তা করাতেন; ইত্যাকার ভাবনা আমাদের মনে বাসা বাঁধতে শুরু করে।

আইয়ুবের (আ.) সাথে আল্লাহর যে বিশেষ বন্ধন ছিল, তা আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে। তিনি সবকিছুর চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভালোবাসতেন এবং তিনি বেশ ভালো করেই জানতেন যে, আল্লাহ যেভাবে তাকে রিজিক দিচ্ছেন, যত্ন নিচ্ছেন, তেমনভাবে কেউ তাকে ভালোবাসে না, আর না যত্ন নেয়।

আল্লাহ কুর'আনে বলেন:

أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّـهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَـٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

'এরাই হলেন ওইসব ব্যক্তি, যাদেরকে আল্লাহ নবীগণের মাঝে নিয়ামত দিয়েছেন। এরা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমরা নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছি, তাদের বংশধর এবং ইব্রাহিম ও ইসরাইলের বংশধর এবং যাদেরকে আমরা হেদায়েত

বা পথপ্রদর্শন ও মনোনীত করেছি, তাদের বংশধর। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো, তখন তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়তো এবং কান্না করতো।'

- সূরা মারইয়াম, ১৯:৫৮

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে নবী-রাসূলগণের সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয়টি আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন। নবী-রাসূলগণের পর যে মানুষগুলো আল্লাহর তরফ থেকে সর্বাধিক উপহার ও অনুগ্রহ লাভ করেছেন, তারা হলেন ওইসব ব্যক্তি, যারা নবী-রাসূলগণের প্রচারিত সত্যকে মেনে নিয়েছেন, সেটার সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদেরকে জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং এরপর রয়েছেন সাধারণ ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ।

আইয়ুব (আ.) এমন একজন নবী ছিলেন, যিনি নিজের চরম অসুস্থতার কারণে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে পারেননি, তাহলে বিছানায় শায়িত থেকে তিনি কি উদ্দেশ্য পূরণ করে যাচ্ছিলেন? বছরের পর বছর কষ্ট ভোগের পর এই অবস্থায় আইয়ুব (আ.) আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করেন।

আইয়ুবের (আ.) দু'আ

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

'এবং স্মরণ করুন আইয়ুবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করে বলেন, 'আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ, দয়াবান।'

- সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৮৩

مَسَّنِيَ: এর অর্থ, যখন দুটি জিনিসের মধ্যে খুব সামান্য যোগাযোগ থাকে।

বহু বছর ধরে ভয়ানক রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও আইয়ুব (আ.) নিজের অবস্থা প্রকাশের জন্য (مَسَّنِيَ) শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যা খুবই আশ্চর্যজনক। তিনি পুরোপুরি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং কাজ করার ক্ষমতা একেবারে হারিয়ে ফেলেন। আইয়ুবের (আ.) বলা উচিত ছিল এই রোগ আমাকে

পুরোপুরি নিঃশেষ ও ধ্বংস করে দিয়েছে, কিন্তু তিনি তা না করে এমন শব্দ দ্বারা দু'আ করেন, যাতে মনে হচ্ছে যে, রোগটি সবেমাত্র তাকে স্পর্শ করেছে।

এমন শব্দ ব্যবহারের কারণ কি? নাকি এর পেছনে এক গূঢ় তাৎপর্য রয়েছে, যা মনোযোগের দাবি রাখে?

আইয়ুব (আ.) এই দু'আর মাধ্যমে এই বিষয়টার স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে আরও বড় ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করছেন এবং তিনি তাকে বর্তমানে যে অবস্থায় রেখেছেন, তা একটি পরীক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। এই রোগটি যদি এমন পর্যায়ে পৌঁছায়, যেখানে গেলে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে পড়বেন, তবে তা হবে তাঁর জন্য সব থেকে বড় ক্ষতি। আল্লাহর রহমত ও করুণা থেকে আশা হারানোর তুলনায় শারীরিক কষ্ট ভোগ করা তাঁর কাছে কিছুই নয়। কোনোকিছু করার ক্ষমতা হারানোর বিষয়টি ধীরে ধীরে আইয়ুবের (আ.) অন্তরে দাগ কাটতে শুরু করে। এসবের কারণে তিনি আল্লাহর ভালোবাসা হারিয়ে ফেলতে পারেন, এই ভয়ে তিনি কাতর। তিনি আল্লাহর কাছে নিজের দুঃখকষ্ট লাঘব বা রোগ নিরাময়ের জন্য কোনো দু'আ করেননি, বরং তিনি আল্লাহর কাছে এই নিবেদন রাখছেন যে, তিনি তাকে এযাবত যেভাবে ভালোবেসে এসেছেন, রহমতের সাথে যেভাবে খেয়াল রেখেছেন, সেটা যেন তিনি অব্যাহত রাখেন। বস্তুত তাঁর কাছে বৈষয়িক বিষয়ের চেয়ে আত্মিক সুস্থতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
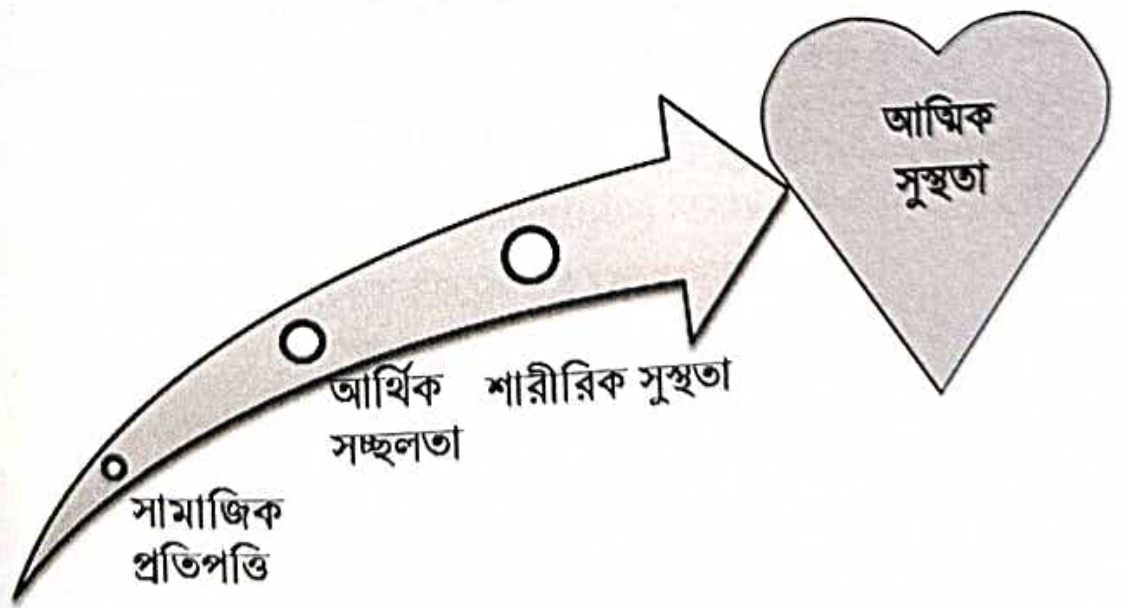
দু'আটি আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে একটি উদাহরণ পর্যালোচনা করি,

যখন কোনো শিশু এসে তাঁর মাকে বলে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, মা! কিন্তু আমার পেট চৌচির হয়ে যাচ্ছে।' শিশুটি তার মায়ের সাথে ভালোবাসার সম্পর্কের ভিত্তিতে যা করলো, তা বোঝানোর জন্য তাকে সবকিছু খুলে বলতে হবে না। মা তাঁর সন্তানের প্রতি নিঃশর্ত ভালবাসার ভিত্তিতে বুঝে যাবেন যে, তাঁর সন্তান ক্ষুধার্ত এবং তিনি তাঁর প্রয়োজন মেটাতে যা যা প্রয়োজন, তাঁর ব্যবস্থা করবেন। ভালোবাসা যখন তীব্র হয়, তখন সবকিছু মুখে বলতে হয় না, এমনকি একটি শব্দ উচ্চারণেরও প্রয়োজন হয় না।

একইভাবে আইয়ুব (আ.) আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে সুন্দর নাম 'আর-রাহমান' দ্বারা তাকে আহ্বান জানাচ্ছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রতিপালকের সাথে তাঁর যে অনন্য সম্পর্ক রয়েছে, সেটাকে সুদৃঢ় করছেন। আল্লাহ তা'আলার ভালবাসাকে বুঝতে হলে আমাদেরকে তাঁর 'আর-রহমান' নামের তাৎপর্য উপলব্ধি করা আবশ্যক।

রহমত-ই কি তাহলে ভালোবাসা?

উত্তর: হ্যাঁ এবং না।

রাসূল (ﷺ)-এর একটি হাদিস অনুসারে রহমত ভালোবাসার একটি রূপ। প্রকৃতপক্ষে রহমত (রহমা) ও ভালোবাসার (হুব্ব) মাঝে ভাষাগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, তা একটি হাদিসে কুদসিতে স্পষ্ট হচ্ছে, আর সেই হাদিসটি নিম্নরূপ:

আমি আর-রহমান (الرَّحْمٰنُ) এবং আমি রাহিম (رَحِمٌ – জরায়ু, মাতৃগর্ভ) তৈরি করেছি এবং আমি এটাকে আমার নাম থেকে উদ্ভূত করেছি।

- সৃষ্টির সাথে আল্লাহর কোনো তুলনা নেই, কিন্তু আল্লাহর সাথে আমাদের যে সম্পর্ক রয়েছে, ওই সম্পর্ককে উপলব্ধি করতে হলে মা-র সাথে আমাদের যে সম্পর্ক রয়েছে, সেটাকে একটা তুলনা হিসেবে এখানে আনতে পারি, যদিও তা হবে সমুদ্রের এক ফোঁটা পানি দিয়ে মহাসাগরকে বোঝার চেষ্টারই মতো।

আইয়ুবের (আ.) ঠিক কি প্রয়োজন, তা উল্লেখ করার দরকার হয়নি, কারণ 'আর-রাহমান' তাঁর যাবতীয় প্রয়োজন ও চাহিদা আছে, তা ঠিকই বুঝতে পারেন। কেননা, তাঁর সাথে রয়েছে আল্লাহর নিঃশর্ত ভালোবাসার সম্পর্ক। কোনো প্রশ্ন বা আর্জি থাকলে স্বাভাবিকভাবে তাঁর একটি জবাব দেওয়া লাগে। আল্লাহ তা'আলা আইয়ুব (আ.) এই দু'আর মাঝে যে আবেদন ছিল, তিনি তা ঠিকই বুঝে যান, যদিও দু'আর মাঝে দৃশ্যত কোনো আর্জি ছিল না। আল্লাহ আইয়ুব (আ.)-কে

রহমতে সিক্ত করলেন এবং তাকে ফিরিয়ে দিলেন স্বাস্থ্য, সম্পদ এবং পরিবার। আল্লাহ বলেন:

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ
وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ

'অতপর আমরা তাঁর আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাঁর দুঃখকষ্ট দূর করে দিলাম, তাঁর পরিবরাবর্গ ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও (নিয়ামত) দিলাম আমার পক্ষ থেকে রহমত হিসেবে। আর এসবই ইবাদাতকারীদের জন্যে (এক প্রকার) উপদেশ।'

- সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৮৪

তাঁর রোগ কিভাবে নিরাময় হয়েছিল তা সূরা সোয়াদে ব্যাখ্যা করা হয়। সেখানে বলা হয়:

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَـٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ

'তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করো। এখানে শীতল পানি রয়েছে গোসল ও পানের জন্য।'

- সূরা সোয়াদ, ৩৮:৪২

তিনি দ্রুত ভূমিতে আঘাত করেন আর সাথে সাথে ঝরনা বেরিয়ে আসে এবং তিনি তাতে গোসল করেন ও সেখান থেকে পানি পান করেন, আর এতে করে তাঁর রোগ ভালো হয়ে যায়। চিকিৎসার এই ধরন দেখে মনে হচ্ছে, তিনি খুব সম্ভবত চর্মরোগে ভুগছিলেন।

যখন আমরা আল্লাহর ইবাদাত করি, তখন মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি হয়। আমরা তাঁর আনুগত্য করি, তিনি যাতে অসন্তুষ্ট না হন, সেই ভয়ে থাকি, শাস্তির ভয়ে ভীত হই। বস্তুত বান্দা যখন প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তখন সব ধরনের অনুভূতিকে ছাপিয়ে ভালোবাসার অনুভূতিটিই সবার উপরে থাকে।

আমরা যখন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করি, তখন এই অনুভূতি হয় যে, তিনি আমাদেরকে নিঃশর্তভাবে ভালবাসেন এবং দেখভাল করেন, যা অন্য কেউ করতে সক্ষম নয়। আমি আল্লাহর ইবাদাত করি, কারণ আমি তাঁকে ভালোবাসি এবং আমার সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে যেভাবে ভালোবাসেন এবং আমার প্রতি যেভাবে মায়া-মমতা ও রহমত প্রদর্শন করেন, সেজন্য আমি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাই। বান্দা যখন এমন মনোভাব নিয়ে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করে, তখন আপনি যে ধরনের পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, যে ধরনের কষ্ট ও বিপদে রয়েছেন, তা আল্লাহ উপযুক্ত সময়ে সমাধান করে দেন। কোন সময়টি আপনার জন্য উপযুক্ত কেবল আল্লাহই ভালো জানেন, তাই তিনি আপনাকে এসব বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন ভালো সময়ের জন্য প্রস্তুত করেন। আর তাই আমাদেরকে আল্লাহর পরিকল্পনার উপর দৃঢ় ঈমান ও আস্থা রাখতে হবে এবং

সবর তথা ধৈর্য ধারণ ও তাঁর শোকর আদায়ের মাধ্যমে তাঁর দেওয়া পরীক্ষাগুলো অতিক্রম করতে হবে।

বিশেষ বার্তা

যখন আল্লাহ তাঁর স্বাভাবিক রীতি থেকে বেরিয়ে তাঁর বান্দাদেরকে বলে দেন যে, এই দু'আটি বিশেষভাবে অমুক লোকদের জন্য, তখন আমাদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে, আল্লাহর কথাকে গুরুত্বের সাথে নেওয়া ও তাতে যথাযথ মনোযোগ দেওয়া।

আগের দু'আগুলোতে আল্লাহ উল্লেখ করেনি, এই দু'আটি ইবাদাতকারী বান্দাদের জন্য উপদেশস্বরূপ। কিন্তু আল্লাহ এখানে এই বিষয়টির উপর বিশেষ জোর দেওয়ার জন্য এমনটি করেছেন। এই দু'আর ভাষা এতই সুন্দর যে, আমরা আমাদের জীবনে যত ধরনের আর্থিক সংকট, বিপদাপদ ও বালা-মুসিবতের মধ্য দিয়ে যাই না কেন, তাঁর সবগুলোকে এই দু'আতে শামিল করে আল্লাহর কাছে প্রতিনিয়ত দু'আ করতে পারবো। কেবল অভিযোগ করার পরিবর্তে আল্লাহর সাথে আমাদেরকে এমন এক বন্ধন ও সম্পর্ক তৈরি করা প্রয়োজন, যার ভিত্তিতে জীবনে যে অবস্থার মধ্যে দিয়েই যাই না কেন, আমরা যেন বুঝতে পারি, আল্লাহর ভালবাসা ও যত্ন আমাদের থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

আল্লাহর উপদেশ যেন আমাদের হৃদয়কে শক্ত না করে, বরং আমাদের গোটা জীবন জুড়ে তাঁর যে ভালবাসা ও রহমত রয়েছে, আমাদের উচিত সেটাকে স্বীকৃতি দেওয়া ও অনুভব করা।

নবী মুসার (আ.) দু'আ

১.

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ
يَقْتَتِلَانِ هَـٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَـٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِى
مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ
قَالَ هَـٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ

'তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন তাঁর অধিবাসীরা বেখবর ছিল। সেখানে তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াই করতে দেখলেন। এদের একজন ছিল তাঁর নিজ দলের এবং অপরজন ছিল তাঁর শত্রু দলের। অতপর যে তাঁর নিজ দলের সে তাঁর শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য চাইলো। তখন মুসা তাকে ঘুষি মারলো এবং এতেই তাঁর মৃত্যু হলো। মুসা বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী।'

- সূরা কাসাস, ২৮:১৫

এই ঘটনাটি নবী মুসার (আ.) যৌবনকালে ঘটে। মিশরের রাজপুত্র হওয়ায় তিনি বিশাল প্রতিপত্তির মাঝেই বড় হচ্ছিলেন। তৎকালীন মিশরের সম্রাট ফেরাউন ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর সাম্রাজ্যের অনেক পুত্র সন্তান হত্যা করেছিলেন, কিন্তু ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া যখন শিশু মুসাকে তাঁর সামনে নিয়ে আসে, তখন সে শিশুটির মায়ায় বিমোহিত হয়ে পড়ে। তৎক্ষণাৎ সে শিশুটিকে দাস হিসেবে গ্রহণ না করে নিজের পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। আমাদের মনে রাখা উচিত, মিসরীয় ও ইসরাইলি দাসদের চামড়ার রঙের মধ্যে অনেক পার্থক্য

ছিল, তা সত্ত্বেও ফেরাউন শিশু মুসাকে রাজপ্রাসাদে উন্মুক্ত বাহুডোরে লালনপালন করছিলেন।

বড়ো হওয়ার সাথে সাথে মুসা (আ.) জানতে পারলেন, তিনি তাঁর পিতামাতার জাতভুক্ত নন, এমনকি তিনি প্রকৃত মিসরীয়ও তো নন, বরং তিনি ইসরাইলি দাস জাতির অন্তর্ভুক্ত। রাজকীয় পরিবেশে লালিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর জাতির কল্যাণ চাইতেন এবং তাদেরকে সহযোগিতা করার সুযোগ খুঁজতেন। একদিন মুসার (আ.) সামনে নিজ জাতির কোনো এক সদস্যকে সাহায্য করার সুযোগ আসে, যা সূরা কাসাসের এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে:
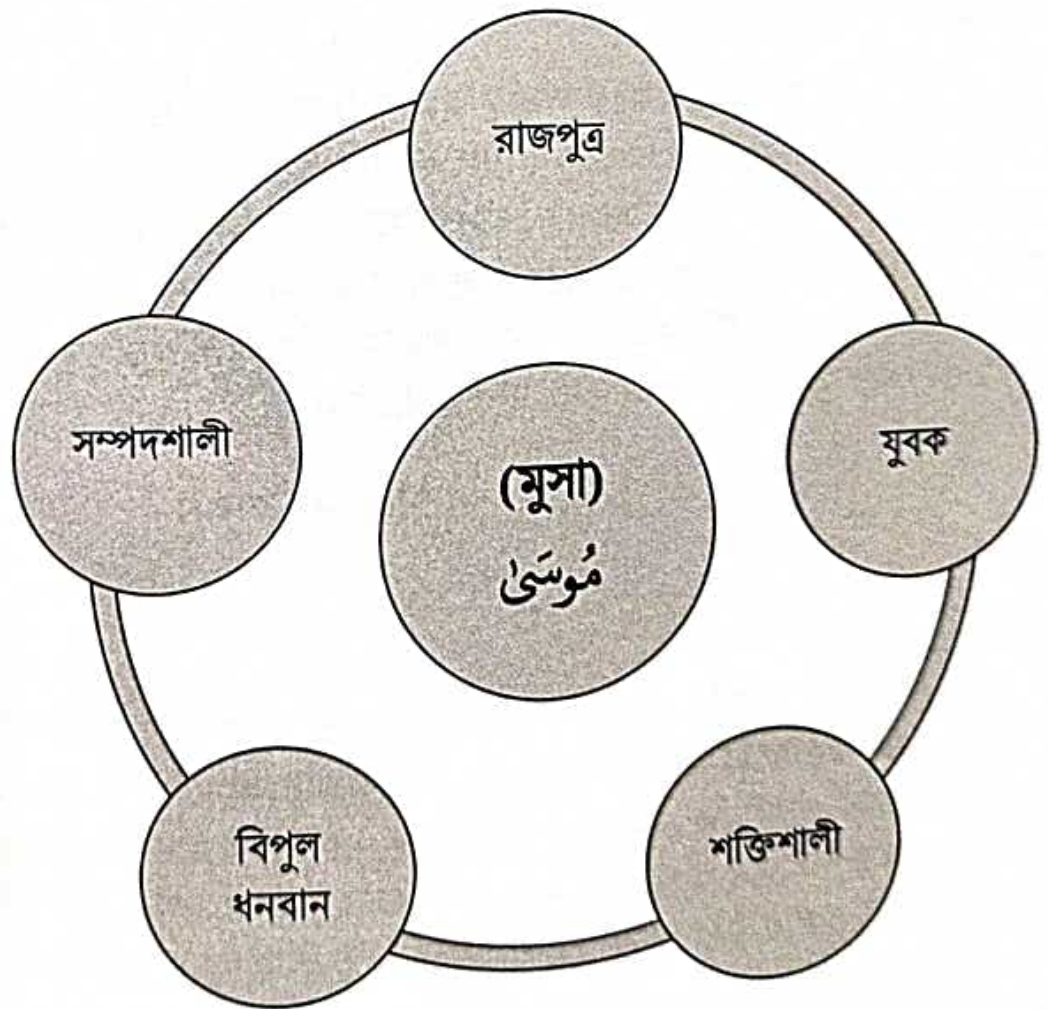
সবকিছু থাকা সত্ত্বেও তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজের সময় ব্যয় করতেন এবং মানুষকে সাহায্য করতেন। এটা তাঁর কাছে কোনো ব্যাপার ছিল না, যেহেতু তিনি একজন রাজপুত্র। তাঁর কাছে ভাল কাজ করা এবং শারীরিক শক্তি নষ্ট না

করাটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যুবকরা কিভাবে তাদের সময় ও শারীরিক সক্ষমতাকে কাজে লাগাবে, এখানে সে ব্যাপারে শিক্ষা রয়েছে।

এটা খুব ভোর বা গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন বা শীতের রাত হতে পারে, যখন রাস্তা ছিল নির্জন এবং শহর ছিল পুরোপুরি শান্ত। 'শহরে প্রবেশ করা' (دَخَلَ الْمَدِينَةَ) শব্দটি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, রাজকীয় প্রাসাদগুলি সাধারণ মানুষদের থেকে দূরে রাজধানীর বাইরে অবস্থিত ছিল। এখানে 'শহরে প্রবেশ করেছে' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু 'শহর থেকে বের হওয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়নি, কারণ নবী মুসা (আ.) রাজপ্রাসাদে থাকতেন। পুলিশের নজরদারি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটা সেরা একটি সময়। যদি তারা জানতে পারে যে, রাজদরবারের কেউ দাসদের সাহায্য করছে, তাহলে তা ভীষণ সমস্যা সৃষ্টি করবে।

মুসা (আ.) দু'জন লোককে লড়াই করতে দেখেন, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ফেরাউনের সেনা, আর অপরজন ছিল ইসরাইলি। ইসরাইলি লোকটি মুসা (আ.)-কে ডাকতে শুরু করে, হে আমার ভাই! আমাকে সাহায্য করো। মুসা (আ.) দেখতে পেলেন যে, ওই লোকটি সৈনিকের হাতে মারা পড়বে, তাই লাফিয়ে ঘুষি মারেন। এক ঘুষিতে সেনাটি পড়ে যায় এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। মুসা (আ.) ঘটনাটি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন এবং বলতে থাকেন:

هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (এটা শয়তানের কাজ)।

শিক্ষা-১

মুসা (আ.) উপলব্ধি করলেন, এটা শয়তানের কাজ এবং কোনো চিন্তা ভাবনা না করে তাড়াহুড়ো করে ঘটনাস্থলে ছুটে যাওয়াটা আসলে তাঁর ভুল ছিল। মুসা (আ.) পুরো পরিস্থিতি জানতেন না। তিনি ধরেই নিয়েছেন, ফেরাউনের সেনারা সবসময় পাপাচার ও অন্যায় করে এবং এবারও তারা তেমনই এক ঘটনা ঘটিয়েছে। তিনি একটুর জন্য থামেননি এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেননি।

তাঁর বোঝা উচিত ছিল, প্রতিটি ঘটনাই আলাদা। এখান থেকে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো, যখনই কোনো সমস্যার মুখোমুখি হবেন, তখনতো থেকে উত্তরণেরও একটা প্রক্রিয়া রয়েছে (পরের পাতার ডায়াগ্রাম দেখুন)। যেকোনো পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তাড়াহুড়ো প্রতিক্রিয়া দেখানোর পরিবর্তে একটু থামা ও চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।
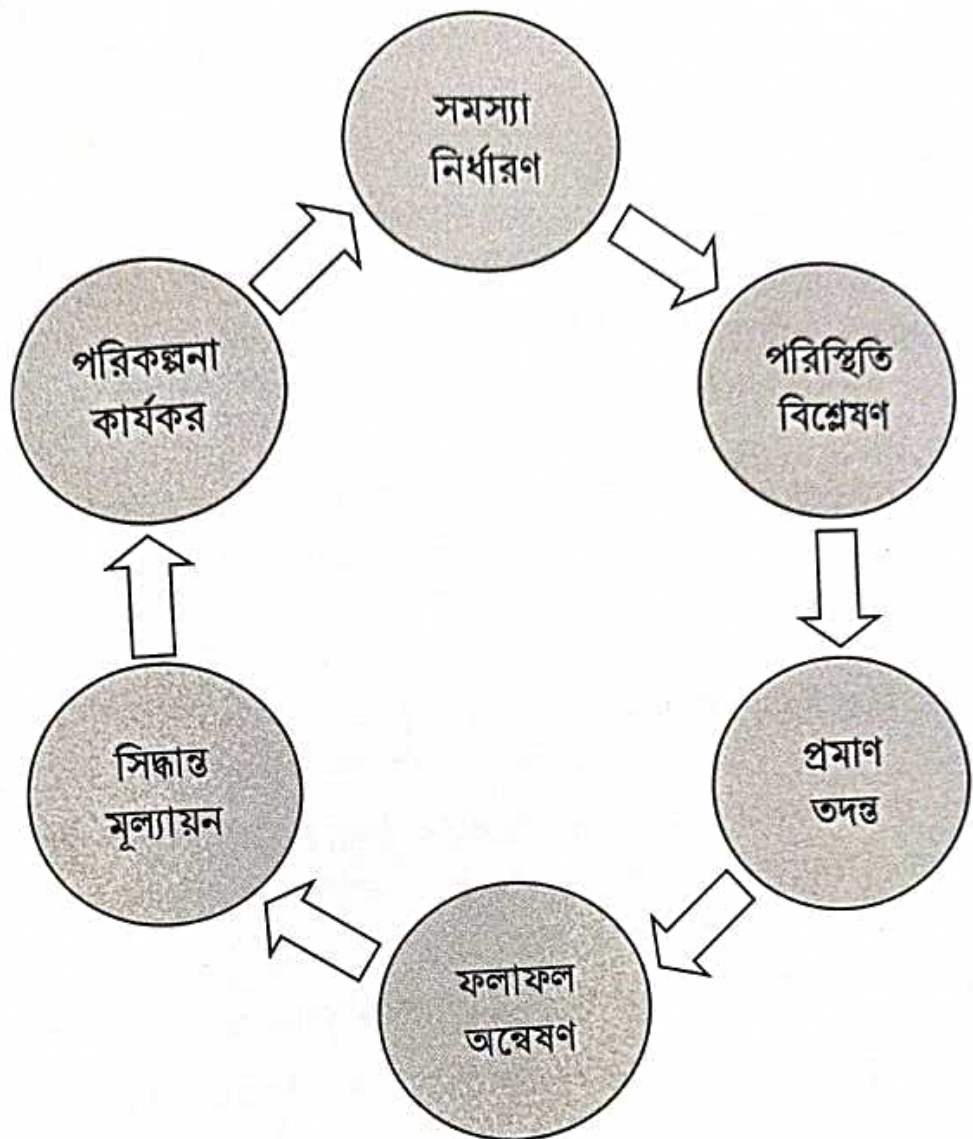
শিক্ষা-২

আমরা দেখতে পাচ্ছি, মুসা (আ.) শয়তানকে দোষারোপ করছেন, যে আমাদেরকে ভুল পথে চালিত করে এবং আমাদেরকে দিয়ে তাড়াহুড়ো করায়, যার ফলাফল শেষমেশ আমাদের অনুকূলে থাকে না। মুসা (আ.) তখনও যুবক এবং তিনি তখনও নবুয়ত প্রাপ্ত হননি, তথাপি তিনি বুঝতে পারলেন, যে এই ভুলে তাঁর কিছুটা ভূমিকা রয়েছে। তাই তিনি নিজের আচরণের দায় নিজের কাঁধে নেন এবং তাৎক্ষনিকভাবে আল্লাহর কাছে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي
فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি নিজের উপর জুলুম করেছি। তাই আমাকে ক্ষমা করুন। অতপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।'

- সূরা কাসাস, ২৮:১৬

মুসা (আ.) তখনও নবী হিসেবে সম্মানিত হননি, তাহলে কিভাবে তিনি জানলেন যে, আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দেবেন, যেখানে তিনি সবেমাত্র একটি বড় পাপ (হত্যা) করেছেন।

প্রকৃত বিশ্বাসীদের শক্তি

যখন একজন মুমিন সত্যিকারভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করে এবং আল্লাহর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় যে, ভুলটি আর তিনি আর পুনরায় করবে না, তখন তাঁর হৃদয়ে এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে, আল্লাহ তাদেরকে কোনো সন্দেহ ছাড়াই ক্ষমা করেছেন।

আসুন আল্লাহ কুর'আনে যা বলেছেন তা পর্যালোচনা করি:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ
اللَّـهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা (মন্দ কাজ ও পাপ করে) নিজেদের উপর জুলুম করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

- সূরা যুমার, ৩৯:৫৩

আল্লাহ কুর'আনের অনেক আয়াতে তাদের প্রতি তাঁর শর্তহীন ভালোবাসা ও ক্ষমার উল্লেখ করেছেন, যারা সত্যিকার অর্থে অনুতাপ করে এবং তাঁর কাছে ফিরে আসে। যখন আমরা মানুষের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তারা আমাদের ক্ষমা করতে পারে, আবার আমরা যে অন্যায় করেছি, তা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে আমাদেরকে লজ্জা দিতে পারে এবং তারা আমাদেরকে আমাদের ভুলগুলি ভুলে যেতে দেয় না। কিন্তু যখন আমরা আমাদের রবের সাথে কথা বলি, তখন ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বদলে যায়। কেননা, তিনি আর-রাহমান ও আর-রাহিম, আর এই কারণে আমরা তাঁর কাছে কোনো সন্দেহ ও ইতস্ততা ছাড়াই ক্ষমা চাইতে পারি এবং আমাদের অন্তর ও হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পারি যে, আমাদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে।

যেহেতু মুসা জানতেন, তিনি রহমত ও অনুগ্রহ থেকে ক্ষমা পেয়েছেন, যা আল্লাহ তাকে দান করেছেন, তাই তিনি বিনীতভাবে আল্লাহর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, তিনি অন্যায়কারী ও দোষীদের সমর্থন করবেন না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে আবারও একই ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন করেন।

এটা আমাদের জন্য উপলব্ধি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রতিজ্ঞা করা সহজ, কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এবং ওই একই পাপে জড়িত না হওয়াটা খুবই কঠিন একটি কাজ। তাই ঈমানে দৃঢ় ও বলীয়ান থাকার জন্য আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর হেদায়েত ও করুণা প্রার্থনা করা আবশ্যক:

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ

'তিনি (মুসা আ.) বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, এরপর আমি আর কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না।'

- সূরা কাসাস, ২৮:১৭

নবী মুসার (আ.) এই প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত বিস্তৃত ভাষায় বিবৃত করা হয়েছে। এর দ্বারা তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন, তা হলো: পৃথিবীতে যারা নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার চালায়, তিনি কখনো তাদের পৃষ্ঠপোষক হবেন না।

মুসা (আ.) পরের দিন সকালে একই পরিস্থিতিতে হোঁচট মুখোমুখি হন। এবার রাস্তাগুলি ব্যস্ত ছিল এবং বাজারের আশেপাশে মানুষ ছিল। যে লোকটি চিৎকার করেছিলেন গতকাল নবী মুসার (আ.) সাহায্য চেয়েছিল, তাকে তিনি তাকে ধমক দেন এবং তিরস্কার করেন। এরপর তিনি মিসরীয়কে আক্রমণ করতে লাগলেন। ঠিক ওই সময় মিসরীয় লোকটি উচ্চস্বরে চিৎকার করে আগের দিনের হত্যার রহস্য সবার কাছে প্রকাশ করে দেয়।

আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, লড়াইটি ইসরাইলি ও মিসরীয় সৈনিকের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল এবং প্রথম দিনের হত্যার বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়, যেমনটি উপরের ঘটনা থেকে জানতে পারি। সম্ভবত মিসরীয়দের কেউ ওই দিনের ঘটনাটি জেনে যায়। একজন ইসরাইলি এতটা বিশ্বাসঘাতক হতে পারে না যে, সে রাজকুমার কর্তৃক সংঘটিত জঘন্য অপরাধের কথা ফেরাউন সরকারকে বলে দেবে, যে রাজকুমার কিনা তাঁরই সম্প্রদায়ের লোক এবং যিনি তাদেরকে নানাভাবে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছিলেন।

শিক্ষা-১

যখন আমরা এমন কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হই, সেখানে সহিংসতা বিরাজমান থাকে, তখন আমাদের দায়িত্ব হলো: আমরা জুলুম বন্ধ করতে কাজ করবো, কিন্তু জুলুমে জড়িত হবো না। ঈমানদার হিসেবে এটা নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য যে, আমাদের আশেপাশের মানুষজন যেন নিরাপদে থাকতে পারে, আর যদি কোনো অন্যায় চোখে পড়ে, তবে সাবধানতার সাথে পরিস্থিতি বিচার করে আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

শিক্ষা-২

আমরা কাকে সাহায্য করছি, তাঁর দিকে নজর রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ব্যাপারে আমাদেরকে নির্বোধ হলে চলবে না।

ভুল / গুনাহ
(বড় বা ছোট)

দায়িত্ব গ্রহণ করা
(ভুল স্বীকার করা)

আন্তরিকভাবে
আল্লাহর নিকট তওবা
করা (আল্লাহর দিকে
ধাবিত হওয়া)

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া
(পুনরাবৃত্তি না করা)

মুমিনগণ বিশ্বাস করে, আল্লাহ
তাওবা কবুল করেছেন এবং
ক্ষমা করেছেন
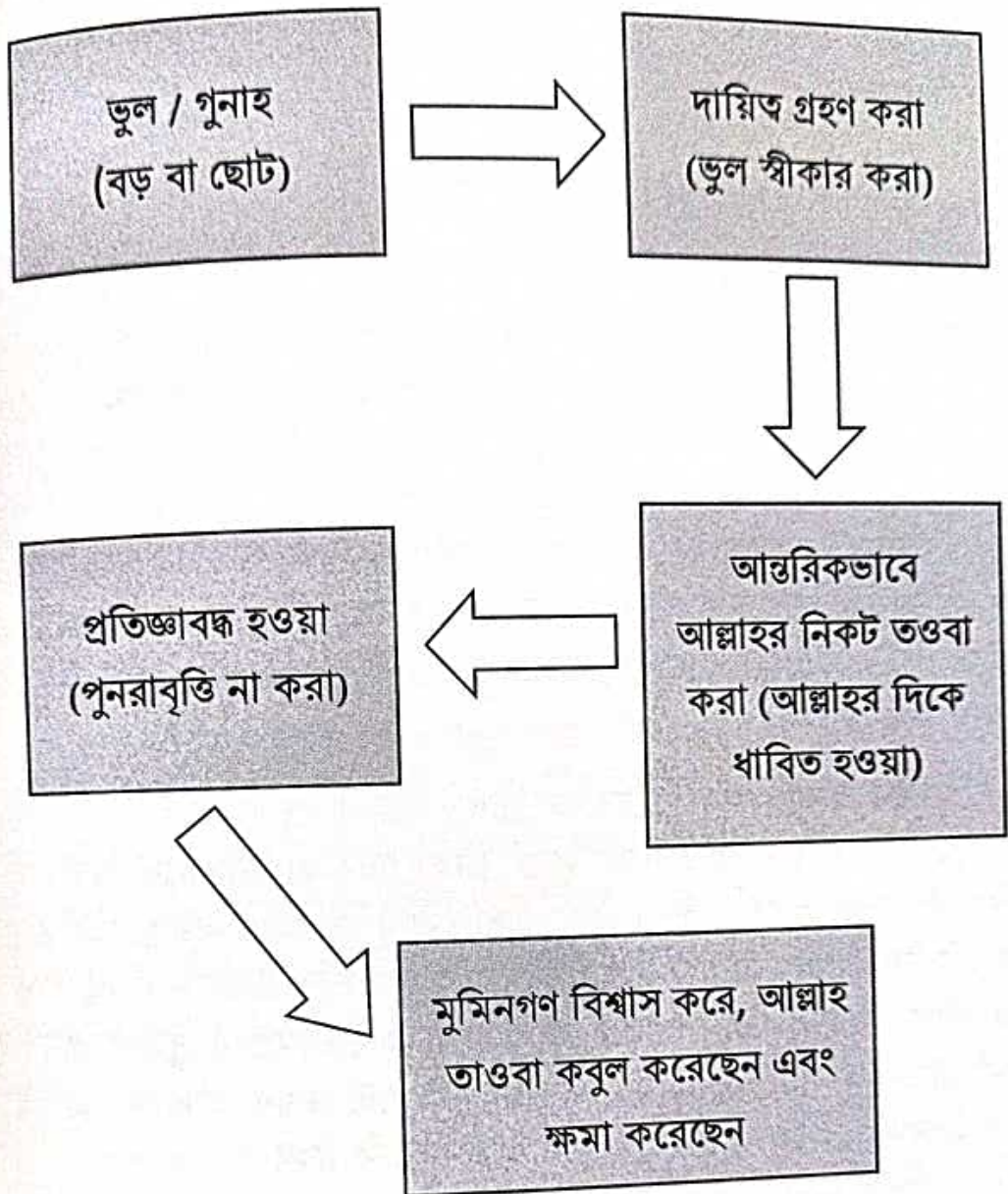
সমস্ত সৈন্যরা মুসা (আ.)-কে খুঁজছিল, তারা প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল, যেহেতু মুসা (আ.) তাদের সহকারী সৈনিককে হত্যা করেছে। তারা গোপনে একটি বৈঠক করে এবং এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা তাকে গ্রেপ্তার করবে না। কেননা, তারা জানতো, তিনি ফেরাউনের খুব প্রিয় একজন। তারা জানতো, যদি তারা মুসা (আ.)-কে বন্দী করে রাজার কাছে উপস্থাপন করে, তবে রাজপুত্র হওয়ার কারণে তাকে ক্ষমা করা হবে। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠে এবং একইসাথে তারা তাকে নিচু চোখে দেখতে শুরু করে, কারণ তারা জেনে গিয়েছিল যে, মুসা (আ.) একজন ইসরাইলি। সৈন্যদের গোপনে বৈঠকে থাকা এক সৈন্য মুসার (আ.) প্রকৃত বন্ধু ছিল এবং তিনি জানতেন মুসা (আ.) কোথায় লুকিয়ে

আছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়ে মুসা (আ.)-কে শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। মুসা (আ.) বন্ধুর উপদেশ গ্রহণ করেন এবং গোপনে শহর ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন:

فَخَرَجَ مِنْهَا خَايِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

'অতপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন
পথ দেখতে দেখতে। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা,
আমাকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা করো।'

- সূরা কাসাস, ২৮:২১

যেমনটি আমরা জানি যে, মুসা (আ.) একজনকে হত্যা করেছিলেন আর এখন সে কারণে লোকেরা তাঁকে হত্যা করতে পিছু নিয়েছে, এমন পরিস্থিতিতে কিভাবে তিনি আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাইতে পারেন, যখন তিনি নিজেই ওই কাজে জড়িত ছিলেন।

যখন আল্লাহ ক্ষমা করে দেন, তখন তাঁর কাছে সাহায্য ও করুণা চাইতে আমাদের লজ্জিত হওয়ার কোনো মানে নেই। তাই ন্যায়নীতিকে অবহেলা করা জালিম সম্প্রদায় থেকে রক্ষার জন্য মুসা (আ.) আল্লাহর কাছে বিনীত প্রার্থনা করেন। ঘৃণার কারণে সামরিক বাহিনী যেকোনো কিছু এবং সবকিছু শেষ করে দিতে পারে, সেজন্য তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজের সুরক্ষা চেয়ে দু'আ করেন। যখন আমরা অত্যাচারীদের মুখোমুখি হই, তখন আমাদের এটাই করা উচিত। কেননা, কেবল আল্লাহই পারেন আমাদেরকে রক্ষা করতে।

২.

মুসা (আ.) তাঁর শহর থেকে পালিয়ে মরুভূমিতে একাকী দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পথ খুঁজে নেওয়ার জন্য তখন কোনো মানচিত্র বা জিপিএস ছিল না। তাই কোথায় যাওয়া যেতে পারে, সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না এবং নিজের চেষ্টায় তাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হবে। রাজপুত্র যিনি কিনা তাঁর পুরোটা সময় প্রাসাদে বাস করে কাটিয়েছেন, তিনি এখন বন্ধ্যা মরুভূমির প্রান্তরে হারিয়ে গেছেন। সময় পার হওয়ার আগেই তাকে খাবার ও পানি জোগাড় করতে হবে। যেহেতু তিনি মরিয়া হয়ে পথ খুঁজছিলেন। উন্মত্তবৎ তাঁর মুখটি বাম এবং ডান দিকে ঘুরছিল কেবল এই ভেবে যে, তিনি কোনদিকে যাবেন। তিনি যেই পথ হাঁটা শুরু করছেন, তিনি নিজেকে যেন সেই একই পথে খুঁজে পাচ্ছেন। মনে হচ্ছে তিনি শুধুই বৃত্তাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং তিনি কোনো এক স্থানে বন্দী হয়ে গেছেন। এরপর হঠাৎ তিনি মাদিয়ানের দিকে মুখ ফিরিয়ে ওই উদ্দেশ্যে চলতে লাগলেন। সম্ভবত সেখান থেকে তিনি শত শত মাইল দূরে ছিলেন, কিন্তু তাঁর মুখ সঠিক দিকেই ছিল, যা তাকে মাদিয়ানে নিয়ে যেতে সহায়তা করে, যেখানে গিয়ে তিনি আশ্রয় ও নিজের ক্ষুৎ-পিপাসা মেটাতে পারেন। ঠিক ওই সময় তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করেন:

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ

'যখন তিনি মাদিয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন তখন বললেন,
আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ
দেখাবেন।'

- সূরা কাসাস, ২৮:২২

সঠিক পথ

এটা মনে রাখা দরকার যে, ওই সময় মাদিয়ান ফেরাউনের সাম্রাজ্যের বাইরে ছিল। সমগ্র সিনাই উপদ্বীপ মিশরের নিয়ন্ত্রণে ছিল না, শুধুমাত্র পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশটি মিশরের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। আক্বাবার উপসাগরীয় পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে বসবাসকারী মাদিয়ানবাসীরা মিসরীয় প্রভাব ও কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত ছিল। এ কারণে মিশর ত্যাগের পর নবী মুসা (আ.) মাদিয়ানের নেতৃত্বে ছিলেন, কারণ এটা মিশরের সবচেয়ে নিকটবর্তী মুক্ত লোকালয়। কিন্তু মাদিয়ানে পৌঁছাতে হলে তাকে মিসরীয় রাজ্যগুলির মধ্য দিয়ে যেতে হবে এবং মিসরীয় সৈন্য ও সরকারি লোকদেরকে এড়িয়ে যেতে হবে। এজন্য তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে সঠিক পথ পাবার জন্য দু'আ করে যাচ্ছিলেন, যাতে তিনি নিরাপদে এই রাজ্যগুলি অতিক্রম করে মাদিয়ানে পৌঁছাতে পারেন।

মাদিয়ান

এই চমৎকার দু'আর পরেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুসা (আ.) জানতে পারেন যে, তিনি সঠিক থেই আছেন, তাই তিনি সোজা ওই পথে হাঁটতে থাকলেন, এটাই ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে জিপিএস তথা পথ-নির্দেশনা। এরপর তিনি নিরাপদে মাদিয়ানে পৌঁছান এবং দেখতে পান যে, রাখালরা মরুদ্যান থেকে তাদের পশুর পালকে পানি পান করাচ্ছে। মুসা (আ.) কিছুটা দূরত্বে ছোট্ট একটি পাহাড়ে বসে দেখতে পান যে, দু'জন মেয়ে পশুর সাথে লড়াই করছে, তারা পশুগুলোকে টানার চেষ্টা করছে, যাতে তারা মরুদ্যানে না চলে যায়। মুসা (আ.) এই দুজন মেয়ের কাছে গিয়ে এসবের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তারা বলে, যেহেতু তারা মেয়ে, তাই তাদের পক্ষে দক্ষ রাখালের মতো করে পশুদের পানি পান করানো সম্ভব নয়। এই দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের বাবা খুবই বৃদ্ধ। এমনকি তাদের বাড়িতে বাবা ছাড়া আর কোনা পুরুষ সদস্যও নেই। তাই মেয়েরা হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে এসব কাজ করতে হচ্ছে। এদিকে যতক্ষণ না সমস্ত রাখাল তাদের পশুদের পানি পান করিয়ে চলে না যায়, ততক্ষণ তাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। পুরো বিষয়টি ওই মেয়েগুলো সংক্ষিপ্ত বাক্যে অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে জানায়, যা তাদের বিনয়ের পরিচায়ক। তারা কোনো অপরিচিত ব্যক্তির সাথে দীর্ঘক্ষণ ধরে আলাপ জারি রাখতে চায়নি, তথাপি তারা এটাও পছন্দ করে না যে, তাদের পরিবার সম্পর্কে ওই ব্যক্তি ভুল ধারণা পাক এবং এমন ধারণার উদয়

যাতে না ঘটে যে, বাড়িতে পুরুষ থাকা সত্ত্বেও তারা বাড়ির মহিলাদেরকে বাইরের কাজগুলি সম্পন্ন করতে পাঠায়।

মুসা (আ.) কথোপকথন না বাড়িয়ে তাদের পশুগুলোকে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে নিয়ে যান এবং পানি পান করানো শেষে তিনি তাদেরকে ছায়াসমৃদ্ধ জায়গায় নিয়ে যান। এখানে মুসা (আ.) আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দু'আ করেন, যা কুর'আনে লিপিবদ্ধ রয়েছে এভাবে:

فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

'তিনি বললেন, 'হে আমার রব, নিশ্চয় আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই নাজিল করবেন, আমি তাঁর মুখাপেক্ষী।'

- সূরা কাসাস, ২৮:২৪

মুসার (আ.) পরিস্থিতি: হে প্রভু, আমি আর কি করবো জানি না, আমার ফিরে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই, খাওয়ার মতো কোনো খাবার নেই, নেই কোনো জামা-কাপড়, আপনি আমাকে যে রিজিক দেবেন, তা আমার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়, যেহেতু আমার হাতে কিছুই নেই।

রাজপুত্র হওয়া সত্ত্বেও মুসা (আ.) কোনো খারাপ মনোভাব বা অহংকার প্রদর্শন করেননি, তিনি তাঁর পরিস্থিতি জানতেন এবং তিনি এটাও জানতেন যে, আল্লাহ তাকে যে অনুগ্রহ দান করবেন, তা অবশ্যই তাঁর জন্য উত্তম প্রতিদান ও উপহার:

'ফকির' শব্দটি 'ফাকর' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ 'একেবারে নিঃস্ব বা ধ্বংস হওয়া', এর আক্ষরিক অর্থ: যখন কোনো ব্যক্তির পিঠটি এতটা পরিমাণে বেঁকে যাওয়া যে তা ভেঙে যায় এবং ঐ ব্যক্তি শারীরিক, আর্থিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়ে, নিজের জন্য সে কিছুই করতে পারে না।

যেহেতু মুসা (আ.) সবকিছু ত্যাগ করে পালিয়ে এসেছিলেন, তাই তাঁর কোনো আশ্রয়স্থল ছিল না, এমনকি কিভাবে তিনি জীবনযাপন করবেন, তাও তিনি জানতেন না। ঠিক এ রকম এক অনুভূতি নিয়েই তিনি আল্লাহর দরবারে এই ফরিয়াদ করেন।

আমাদের এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, যখন কোনো ঈমানদার ব্যক্তি ভুল করেন, তখন প্রথা যে কাজটি তিনি করেন, তা হলো অনুতপ্ত হওয়া, পুনরায় যাতে ওই ভুল না হয়, তাঁর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া এবং এই আস্থা পোষণ করা যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন, এই বিষয়টি আমরা ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি। এমনটি করার পরের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে: মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সৎকর্ম করার ব্যাপারে ব্যাপক উৎসাহ অনুভব করা।
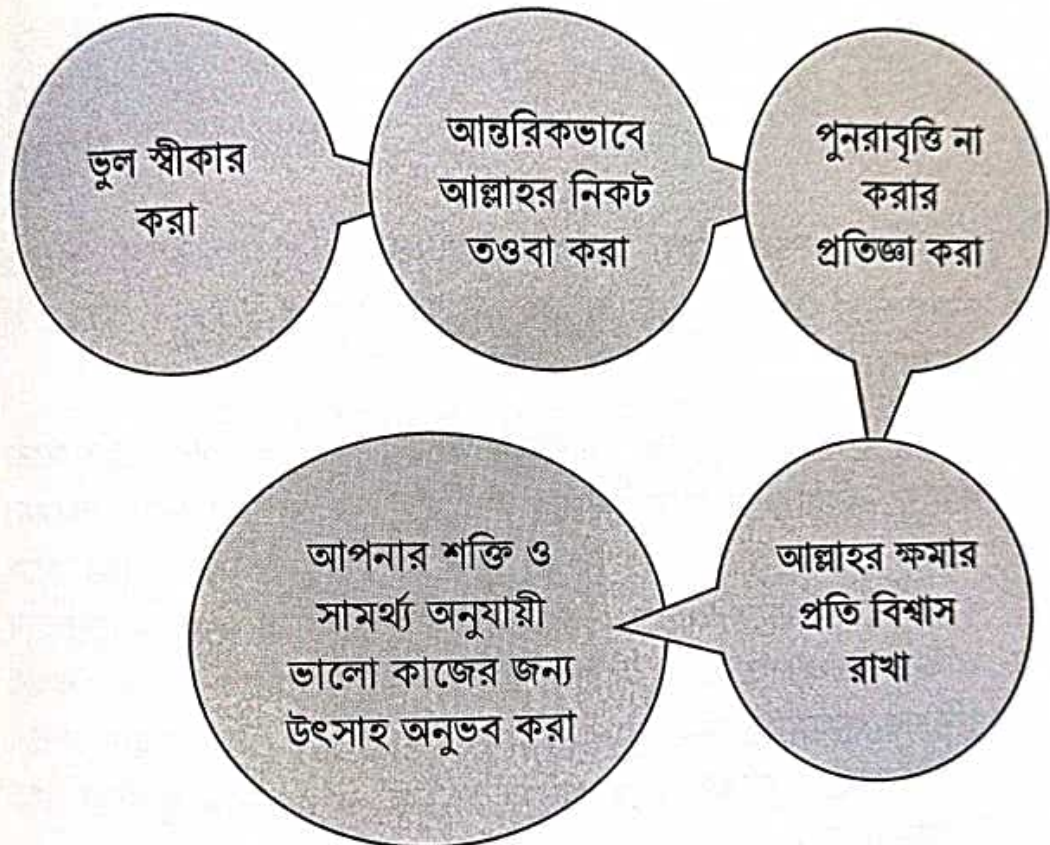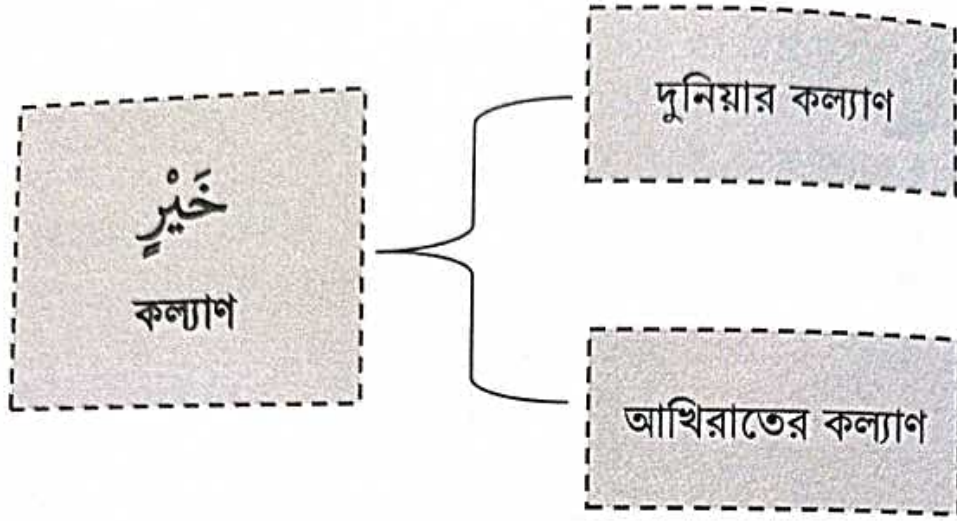
যে ঈমানদার ভুল করে, অতপর সে নিজেকে শুধরে ভালো কাজের ব্যাপারে ব্যাপকভাবে উৎসাহী হয়, আল্লাহ তা'আলাকে দু ধরনের খায়ের বা কল্যাণ দান করেন।

১. **দুনিয়ার কল্যাণ:** বাড়িঘর, পোশাক, মর্যাদা, অর্থ ও পরিবারের মতো পার্থিব সুবিধার আকারে আল্লাহ 'খায়ের' বা কল্যাণ প্রদান করেন। যেহেতু মুসার (আ.) কাছে কিছুই ছিল না, তাই তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করেন, যাতে আল্লাহ তা'আলা বাঁচার জন্য বা জীবন ভালোভাবে অতিবাহিত করতে তাকে সাহায্য করেন। এই দুনিয়াতে 'খায়ের' অর্থাৎ দুনিয়ার কল্যাণের জন্য দু'আ করা ভুল নয়, বরং এই দুনিয়ার কল্যাণ অনেকক্ষেত্রেই আমাদেরকে আরও সক্রিয় ও কার্যকর মুসলিম হতে সাহায্য করে।

২. **আখিরাতের কল্যাণ:** যখন আমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ভাল কাজ করার জন্য ব্যাকুল থাকবো, তখন আমরা আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে অভাবী কাউকে সাহায্য করার সুযোগ পেলে তা হাতছাড়া করবো না। এভাবে আমরা আমাদের নেক আমলগুলো আল্লাহর কাছে জমা করছি এবং তাঁর আরও নিকটবর্তী হচ্ছি। তিনি তখন আমাদের নেক আমলগুলো গ্রহণ করেন, যদি তা আন্তরিকতার সাথে করা হয় এবং এর বিনিময়ে বিচার দিবসে তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য রহমতের দরজা খুলে দেন। মুসা (আ.) নিজের প্রতি অন্যায় করেন এবং তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, একইসাথে ঈমানদার হিসেবে তিনি

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য সৎকর্ম করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহর আরও নিকটবর্তী হন, যাতে তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের 'খায়ের' বা কল্যাণ লাভ করতে পারেন।

আল্লাহর তরফ থেকে আসা খায়ের বা কল্যাণ

যখন আমরা আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে ভাল কাজ করার কোনো সুযোগ পাই, তখন আমাদের এমনটি ভাবা উচিত নয় যে, তাদেরকে সাহায্য করে আমরা তাদেরকে সম্মানিত করছি, বরং তারা আমাদেরকে সম্মানিত করেছে, যেহেতু তাদের মাধ্যমে আমরা একটি ভাল কাজ করতে পেয়েছি এবং আল্লাহর তরফ থেকে খায়ের বা কল্যাণ লাভ করেছি:

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ
لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ

'অতপর বালিকাদ্বয়ের একজন লজ্জা জড়িত পদক্ষেপে তাঁর কাছে আগমন করলো এবং বললো, আমার পিতা আপনাকে ডেকেছেন যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন, তাঁর বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করেন।'

- সূরা কাসাস, ২৮:২৫

এই দুই মেয়ে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে আগে বাসায় ফিরে এবং যা যা ঘটেছিল, তা তাদের পিতাকে জানায়। পিতা বিনয় অনুভব করেন এবং মুসা (আ.)-কে প্রতিদান দিতে চান। এজন্য তিনি তাঁর ওই মেয়েকে মুসা (আ.)-কে তাদের বাড়িতে আসতে আমন্ত্রণ জানাতে পাঠান, যে তাঁর উদার আচরণে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। আর তাই ওই মেয়েটি বিনয়ের সাথে লাজুক হয়ে মুসার (আ.) দিকে এগিয়ে গেল।

'অতপর বালিকাদ্বয়ের একজন লজ্জা জড়িত পদক্ষেপে তাঁর কাছে আগমন করলো' বাক্যটি উমর (রা.) এভাবে ব্যাখ্যা করেন, সে তাঁর স্বীয় মুখমণ্ডলকে তাঁর পোশাকের বর্ধিত অংশ দিয়ে ঢেকে নম্রভাবে হেঁটে এগুতে থাকে, এটা ওইসব নির্লজ্জ নারীর মতো নয়, যারা যেখানে খুশি সেখানে ঘুরে বেড়ায় এবং কোনো রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই যেখানে সেখানে প্রবেশ করে।

বিনীতভাবে তিনি মুসা (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে এসব কথা বলেন, কারণ অন্য একজন পুরুষের কাছে তাঁর এভাবে একা আসার পেছনে একটি শক্ত যুক্তি দেখাতে, কেননা, কেউ যদি কোনো অসহায় নারীকে সহায়তা করেন, তবে তাঁর জন্য ওই পুরুষকে যে পুরস্কৃত করতে হবে, এমনটি মোটেও প্রয়োজনীয় নয়।

প্রতিদানের কথা শোনার পর তাৎক্ষণিকভাবে মুসা (আ.) তাঁর বাড়িতে যেতে তাকে অনুসরণ করেন, যা তাঁর চরম অসহায়ত্বের অবস্থা নির্দেশ করে, যে অবস্থাতে মুসা (আ.) নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন। খালি হাতে মিশর ত্যাগ করে, কমপক্ষে দীর্ঘ আট দিনের পথ অতিক্রম করে তিনি এখানে আসেন। এই দীর্ঘ যাত্রায় তিনি ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত ছিলেন। সর্বোপরি, অপরিচিত জায়গায় আশ্রয় পাওয়া এবং তা তিনি কোনো এক সহানুভূতিশীল ব্যক্তির থেকে পাবেন, তা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে, তাঁর করা সামান্য সহায়তার বিনিময়ে তাকে পুরস্কার গ্রহণের জন্য যে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তিনি তাতে সাড়া দেন এবং ওই মহিলার সাথে যেতে তিনি কোনো দ্বিধা করেননি। তিনি নিশ্চিতভাবে এটা ভেবেছিলেন যে, তাঁর সবেমাত্র করা দু'আর উত্তর আল্লাহ তা'আলা দিতে শুরু করেছেন। তাই স্বীয় প্রতিপালকের দেওয়া আতিথেয়তাকে উপক্ষো করাটা হবে অপ্রয়োজনীয় আত্ম-মর্যাদা দেখানোর শামিল:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

'(ওই দুই নারীর) পিতা (মুসাকে) বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকরি করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ করো, তবে তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাইলে তুমি আমাকে সৎকর্মপরায়ণ পাবে।'

- সূরা কাসাস, ২৮:২৭

মুসার (আ.) সততা ও আন্তরিকতা

মুসা (আ.) পুরো ঘটনা মেয়েদের পিতার কাছে জানান এবং তাঁর সততা ও আভিজাত্য দেখে ওই নারীদ্বয়ের পিতা সত্যিই মুগ্ধ হন। সম্ভবত, তাদের পিতা ভ্রমণকারীকে কয়েকদিন তাঁর কাছে থাকতে দেন, কিন্তু ওই সময় কোনো এক মেয়ে তাঁর এমনটি করার পরামর্শ দেন। ওই পরামর্শটি এরূপ, 'বাবা, আপনি বুড়ো হয়ে গেছেন এবং তাই আমরা মেয়েদেরকে বাইরের দায়িত্ব পালনের জন্য বাইরে যেতে হয়। আমাদের কোনো ভাই নেই, যারা এগুলো করতে পারে। অতএব, আপনি এই ব্যক্তিকে চাকর হিসেবে নিয়োগ করতে পারেন। তিনি শক্তিশালী এবং সব ধরনের কঠোরতার মুখোমুখি হতে পারবেন এবং তিনি বিশ্বাসযোগ্যও বটে। তিনি তাঁর মহৎ প্রকৃতির কারণে যখন আমাদেরকে অসহায় অবস্থায় দেখেন, তখন তিনি আমাদেরকে সহায়তা করেন, কিন্তু তিনি কখনোই আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাননি।'

অন্যদিকে মুসার (আ.) জন্য আল্লাহ তা'আলারও পরিকল্পনা ছিল এবং তিনি তাকে সর্বোত্তম উপায়ে খায়ের বা কল্যাণ দান করার সিদ্ধান্ত নেন, আর ঠিক তাই ঘটে, যখন ওই নারীদ্বয়ের পিতা তাঁর কন্যাদ্বয়ের যেকোনো একজনকে মুসার (আ.) হাতে বিবাহের মাধ্যমে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করেন।

বিবাহ

মেয়ের পরামর্শে মুসা (আ.)-কে তাৎক্ষণিকভাবে এমন প্রস্তাব দেওয়া পিতার আবশ্যক নয়। কেউ হয়তো মনে করতে পারেন যে, যথাযথ বিবেচনার পরপরই তিনি এ সিদ্ধান্ত নেন। তিনি অবশ্যই ভেবেছিলেন, 'নিঃসন্দেহে সে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর মতো একজন সুস্থ ও সবল যুবককে ওই বাড়িতে চাকর হিসেবে চাকরি দেওয়া ঠিক হবে না, যেখানে উপযুক্ত মেয়ে রয়েছে। যখন তিনি কোনো এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ভদ্র, শিক্ষিত ও সভ্য মানুষ, (যেমনটি তিনি মুসার বিবরণী থেকে জেনেছেন), তখন কেন তাকে জামাই হিসেবে ঘরে রাখা হবে না?' এ সিদ্ধান্তে পৌঁছার পর তিনি মুসার (আ.) সাথে উপযুক্ত সময়ে কথা বলতে পারেন। মুসা (আ.) মেনে নেন এবং এভাবে আল্লাহর কাছে খায়ের বা কল্যাণের জন্য যে দু'আ করেন, তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে পূর্ণতা লাভ করে।

আল্লাহ এমনভাবে সবকিছুর ব্যবস্থা করে দেন, যা আমরা বুঝতেও পারি না। একদিকে মুসা (আ.) একেবারে নিঃস্ব ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত ঈমানদার হওয়ায় তিনি আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন এবং তিনি আল্লাহর কাছে হেদায়েত ও খায়ের বা কল্যাণ লাভের জন্য প্রতিনিয়ত দু'আ করে যান। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আর জবাব দেন এবং তাকে খায়ের (কল্যাণ) ও রিজিক দান করেন, কেবল এক বছরের জন্য নয়, বরং পুরো ১০ বছরের জন্য, যেখানে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনদের নিয়ে বসবাস করেন। অত্যধিক প্রয়োজন, হতাশা ও ভীষণ মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও কেবল সত্যিকার ঈমানদার হওয়ার কারণে অন্যের কষ্ট লাঘবের মুসা (আ.) নিজেকে এক উপকারী হাতিয়ারে পরিণত করেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন রহমতে সিক্ত করেন যে, তিনি (মাদিয়ানের) এই পরিবাবের মাধ্যমে তাকে উদ্ধার করেন।

মানুষ যখন আমাদেরকে সহায়তা করে এবং নিরাপত্তা দেয়, বস্তুত তখন তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে। 'খায়ের' (কল্যাণ) ও 'রিজিক' (অনুগ্রহ), যা আমাদের দরজায় কড়া নাড়ে, সেগুলোকে দূরে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়। বস্তুত এগুলো সরাসরি আমাদের জন্য আসমান থেকে নাজিল হওয়া বিশেষ প্যাকেজ।
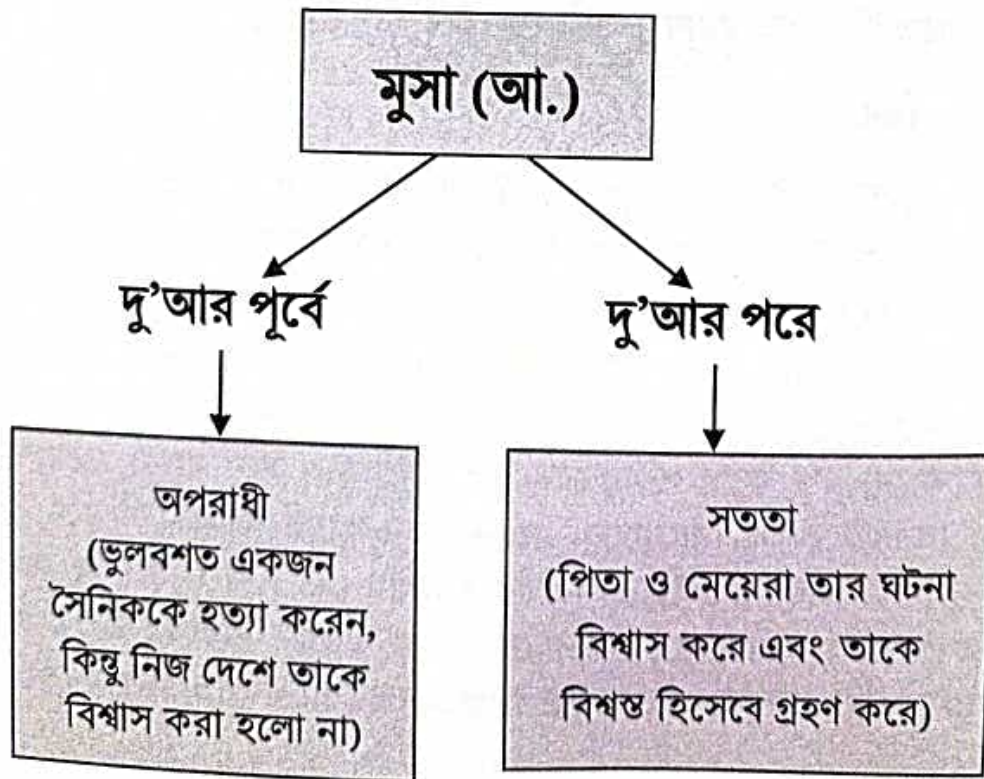
শক্তি
(তিনি দাস সম্প্রদায়কে সাহায্য করতে চাইতেন)
সুরক্ষা
(বৃদ্ধ পিতা ও দুই মেয়ে একা থাকায় তিনি তাদেরকে রক্ষা করতেন)
প্রাসাদে বসবাস
(অবিশ্বাসীদের দ্বারা বেষ্টিত জায়গা)
শ্বশুরবাড়িতে সাথে থাকা
(মুমিনদের দ্বারা বেষ্টিত জায়গা)
খায়ের (কল্যাণ)
(আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা অতি সত্বর তার জন্য খাদ্য,পানি, কাপড় ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন)
অনুগ্রহ (রিজিক)
(পালাতে গিয়ে তিনি দেখেন যে, তিনি অসহায়, তার কাছে খাবার, পানি, কাপড় ও থাকার জায়গা বলে কিছুই নেই)
একাকী
(তিনি পুরোপুরি নিঃসঙ্গ ছিলেন। তার সাথে তার মা ও তার সম্প্রদায় ছিল না)
সাথি
(আল্লাহ তাকে ধার্মিক স্ত্রী ও বিশ্বাসী একটি পরিবার দিয়ে অনুগ্রহ করেন)

৩.

বহু বছর কেটে যায়, মুসা (আ.) শ্বশুরের সাথে করা চুক্তি পূরণ করে তাঁর পরিবার নিয়ে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি (সিনাই) পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পান। তিনি তাঁর পরিবারকে বলেন, 'এখানে অপেক্ষা করো, আমি আগুন দেখতে পাচ্ছি, হয়তো সেখান থেকে কিছু সংবাদ বা আগুন নিয়ে আসবো, যাতে তোমরা নিজেদেরকে গরম করতে পারো।' - সূরা কাসাস, ২৮:২৮

মুসা (আ.) নিজের জীবন বাঁচাতে শহর থেকে পালান এবং নিজেকে দুষ্কর্মীদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করেন, কারণ তারা তাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু এখন আল্লাহ তাকে ফিরে যেতে এবং এই লোকেরা যে সত্যসত্যই অবাধ্য ও জালিম, তা তুলে ধরতে বলেন। মুসা (আ.) নবুয়ত লাভ করেন, আর এখন তাকে আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌঁছে দেওয়া এবং ফেরাউন ও তাঁর সম্প্রদায়কে ইসলামের দিকে আহ্বান করার বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করা হয়:

قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

(মুসা) বললো, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে
এই জালিম সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করুন।'

- সূরা কাসাস, ২৮:২১

মুসা (আ.) আল্লাহ কাছে দু'আ করেন, যাতে তিনি তাকে অন্যায়কারীদের হাত থেকে বাঁচান।

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

'নিশ্চিতভাবে তারা অবাধ্য জাতি।'

- সূরা যুখরুফ, ৪৩:৫৪

আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে ওইসব জাতির কাছে ফিরে যেতে বলছেন, যারা সত্যিকারভাবে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে গেছে।

নবীগণ যখন তাদের সম্প্রদায়কে দাওয়াত দেন, তখন তাদের সম্প্রদায় তাদের বিরুদ্ধে যায় এবং তাদের ক্ষতি করতে চায়। কিন্তু মুসার (আ.) সম্পদ্রায় তো দাওয়াত পাওয়ার আগে থেকেই তাঁর রক্তের জন্য পিপাসার্ত ছিল। ভুলবশত তিনি যে হত্যাকাণ্ড করেছিলেন, তাঁর প্রতিশোধ নিতেই তারা তাকে হত্যা করতে দৃঢ়বদ্ধ ছিল।
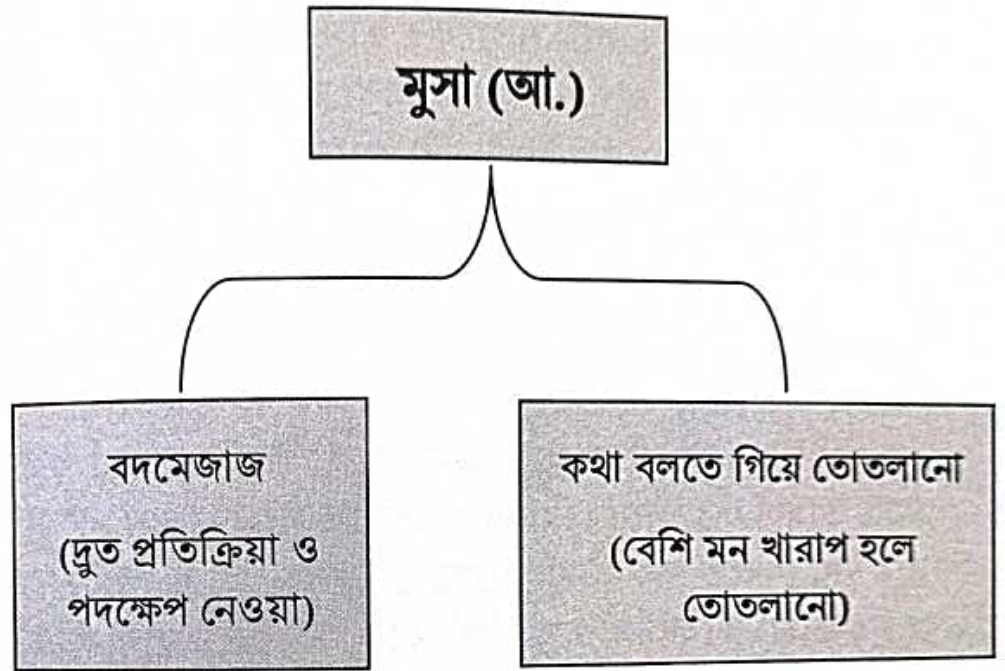
মুসা (আ.) তাঁর শক্তি ও তাঁর সীমাবদ্ধতাগুলি জানতেন। তাই আল্লাহ যখন তাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেন, তখন তিনি সাথে সাথে আল্লাহর কাছে খুবই সুন্দর এক দু'আ করেন, যেখানে তিনি তাঁর ভাই হারুন (আ.)-কে তাঁর এই কাজের সাথি বানানোর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি এখন অনেক বছর ধরে তাঁর ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করেননি, তথাপি তিনি এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম যে, (এমন গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য) তাঁর খুব দৃঢ় সমর্থনের দরকার হবে, যার উপর তিনি ভরসা করতে পারেন, যে তাকে উৎসাহ দেবে, প্রদান করবে নিরাপত্তা এবং তিনি যে মিশনে নেমেছেন, তাঁর স্বীকৃতি দেবে। আর এটা তাঁর নিজের ভাই ছাড়া আর কেউ নয়। তিনি আরও জানতেন, তাঁর ভাই হারুন বক্তব্যদানে বেশ দক্ষ। তিনি তাঁর বাকপটুতার প্রশংসা করেন এবং এটা ভাবেন যে, তিনি যদি ফেরাউনের সাথে কথোপকথনের সময় রাগান্বিত বা হতাশ হয়ে পড়েন, তবে হারুন (আ.) তাকে সাহায্য করবেন। ফেরাউনের দরবারে যে ঘটনাটি ঘটে, তা আমাদের জানা, যেখানে হারুন (আ.) একটি শব্দও বলেননি, তবে মুসার (আ.) সাথে তাঁর ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

মুসা (আ.) যে দু'আটি করেছিলেন, তা পর্যালোচনা করা যাক:

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ

'এবং আমার ভাই হারুন, সে আমার চেয়ে প্রাঞ্জলভাষী। তাই তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন জানাবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।'

- সূরা কাসাস, ২৮:৩৪

সহোদর

সহোদরদের মধ্যে বিরাজমান সদাচরণকে স্বীকৃতি দেওয়া কঠিন একটি কাজ। যেমনটি আমরা কুর'আনের বিভিন্ন কাহিনীতে সহোদরদের মাঝে হিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃশ্য দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ, ইউসুফ (আ.) এবং তাঁর ভাইদের ঘটনা এবং দুই ভাইয়ের (হাবিল ও কাবিল) মধ্যে ঘটা প্রথম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। সহোদরদের মধ্যস্থ হিংসা খুবই গুরুতর একটি বিষয়, যা পরিবারকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

শিক্ষা

মুসা (আ.) খুবই সুন্দর এক দু'আ করেন, যা আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ এক বার্তা ও শিক্ষা দেয়, আমাদের উচিত নিজেদের ভাইবোনদের মাঝে যে শক্তি ও সামর্থ্য থাকে, তাঁর স্বীকৃতি দেওয়া। অত্যন্ত শক্তিশালী মর্মবিশিষ্ট শব্দ رِدْءً (রিদআন) ব্যবহার করে তিনি এটা স্পষ্ট করেছেন যে, কেন তিনি তাঁর দু'আতে তাঁর ভাই হারুনকে নিজের সাথি হিসেবে চেয়েছিলেন। উপরন্তু তিনি يُصَدِّقُنِي (ইউসাদ্দিকুনি) শব্দ ব্যবহার করেন, যা আল্লাহর কাছে যৌক্তিকভাবে তাঁর মিশনের তাঁর ভাইয়ের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

রِدْءً
রিদআন
প্রাচীরের অবলম্বন, যদি তা সরিয়ে নেওয়া হয়, তবে ভবনটি ধসে পড়বে
মুসা (আ.) আক্রমণাত্মক হবেন, তাই তার নৈতিক সমর্থন হিসেবে তার পেছনে হারুনের থাকা প্রয়োজন
সাক্ষী
গোটা সমাজ তাকে মিথ্যাবাদী বলবে, তাই তার ভাই হারুনের প্রয়োজন, যে তাকে বিশ্বাস করবে এবং স্বীকৃতি দেবে
يُصَدِّقُنِي
ইউসাদ্দিকুনি
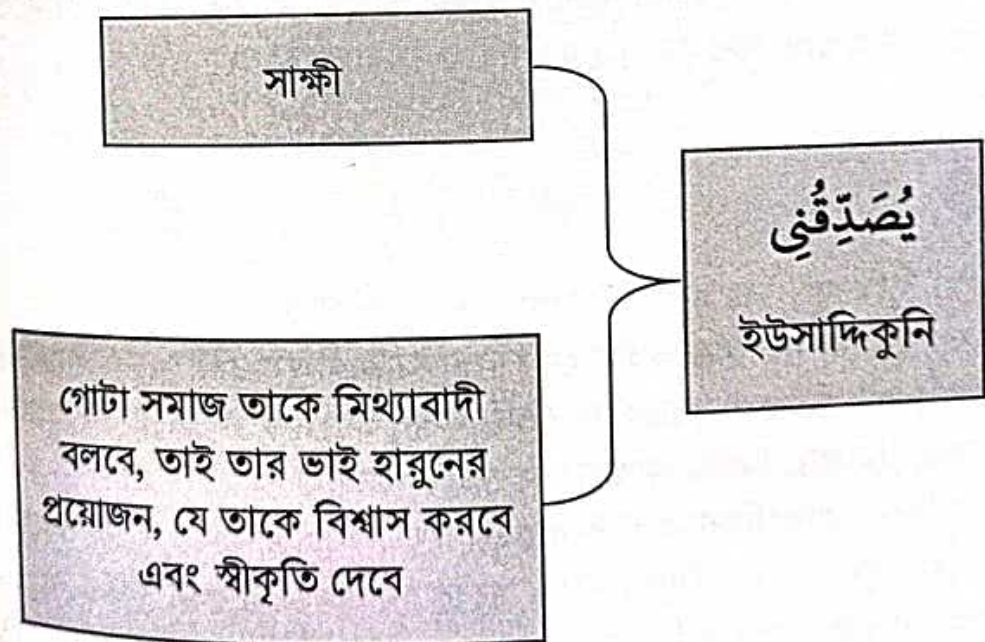
যখন মুসা (আ.) ফেরাউনের কাছে পৌঁছাবেন, তখন ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও সমালোচনা শুরু করবে, আর যখন আপনি অন্যের মুখে নিজের সমালোচনা শুনবেন, (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) আপনি তা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন, যা আপনার মনকে কলুষিত করে। এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন কোনো সৎ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তির কাছ থেকে ইতিবাচক মনোবৃত্তির পুনর্বাস্তবায়ন বা চাঙ্গাকরণ, যা প্রতিনিয়ত আপনাকে আপনার মিশন ও পথ সম্পর্কে স্মরণ করাবে। এটা যেমন আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয়, ঠিক তেমনি তা নবী ও রাসূলদের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয়।

সত্যায়ন বা স্বীকৃতি

আমাদের প্রিয়জনদেরকে স্বীকৃতি দেওয়াটা খুব জরুরি। প্রশংসা পাওয়ার প্রতি আমাদের অভ্যস্ত হওয়া উচিত নয়, তথাপি এটা নবী (ﷺ)-এর সুন্নাহ যে, তিনি যখন লোকদের মাঝে ভাল কিছু দেখতে পেতেন, তখন তিনি তাদের শক্তি ও সামর্থ্যের স্বীকৃতি দিতেন। আমাদের সকলেরই বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মুসার (আ.) দু'আ কবুল করেন। তিনি জানতেন, হারুনের (আ.) উপস্থিতি মুসা (আ.)-কে শান্তি ও নিরাপত্তার অনুভূতি দেবে।

৪.

ফেরাউনকে সম্বোধন করার যে মিশন আল্লাহ মুসা (আ.)-কে দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে তিনি এটা নিশ্চিত করেন যে, তিনি মুসা (আ.)-কে সবচেয়ে বড় মুজেজা দান করেছেন, যা তাঁর মিশন বাস্তবায়নে তাকে সাহায্য করবে। কেননা, তিনি এমন এক রাজার মোকাবিলা করতে যাচ্ছেন, যে কিনা জমিনের বুকে সবচেয়ে বড় অত্যাচারী। মুসার (আ.) মিশন যাতে সহজ হয় এবং তা যেন কঠিন না হয়, সেটা আল্লাহ নিশ্চিত করতে চাচ্ছিলেন, আর মুসা (আ.) বিচক্ষণ হওয়ায় জানতেন যে, তাঁর আসল মিশন হচ্ছে: নিজের কথার মাধ্যমে ফেরাউনের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া।

মুসা (আ.)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছে শক্ত শ্রোতা, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অত্যাচারীর সাথে কথা বলার জন্য। মুসা (আ.) জানতেন, তাকে অবশ্যই তাঁর নিজস্ব শক্তির সন্ধান করতে হবে, যেহেতু তিনি তাঁর নিজস্ব দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত।

আমরা জানি, মুসা (আ.) বদমেজাজি ছিলেন, আবেগের বশবর্তী হয়ে তিনি খুব দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতেন এবং যখন হতাশ হয়ে পড়লে তোতলাতেন। এ কারণে তাঁর পক্ষে আলোচনা সামনে বাড়িয়ে নেওয়া বেশ কঠিন হয়ে যেতো। তাই স্বীয় বক্ষকে প্রসারিত করার জন্য অত্যন্ত চমৎকার ভাষায় তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করেন:

দু'আর প্রথম অংশ

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

'মুসা বললেন, হে আমার পালনকর্তা!
আমার বক্ষ প্রশস্ত করুন।'

- সূরা ত্বোয়াহা, ২০:২৫

শিক্ষা

যেকোন কাজ সম্পাদনের আগে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমাদের অন্তরের অবস্থা জেনে নেওয়া। অন্তর যদি সঠিক জায়গায় না থাকে, তবে আমরা যাই করি না কেন, তাঁর কোনো অর্থ বা তাৎপর্য থাকে না। অন্তর যখন সঠিক জায়গায় থাকে, তখন ওই অন্তর থেকে যা আসে, তা সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে অন্য অন্তরে প্রবেশ করে।

আসুন 'শারহুস সুদুর' তথা বক্ষকে প্রশস্ত করার কি তাৎপর্য, তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করি:
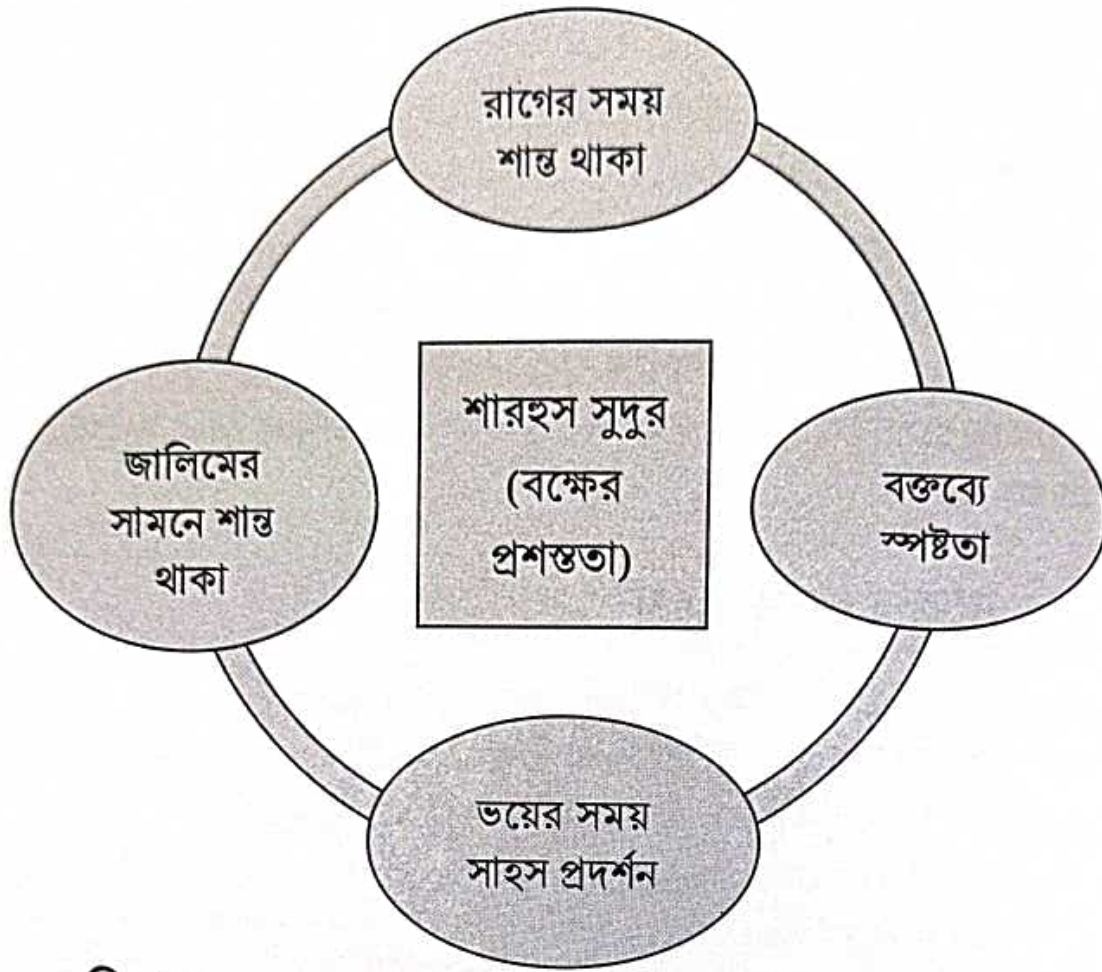
বিশ্লেষণ

স্বীয় অন্তরকে সাহস দিয়ে পূর্ণ করতে মুসা (আ.) আল্লাহর কাছে দু'আ করেন, যাতে রাসূলের মহান মিশনের সাথে জড়িত দায়িত্ব তিনি পূর্ণ আস্থার সাথে পালনে সক্ষম হন। মুসা (আ.) এটার জন্য দু'আ করেছিলেন, কারণ তিনি এই মহান মিশনের গুরু দায়িত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি জানতেন, তাঁর অন্তরকে শান্ত ও স্থির করা আবশ্যক, যদি তাঁর অন্তর সঠিক জায়গায় না থাকে, তবে তিনি রিসালাতের বার্তা যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে এবং নিজের উদ্দেশ্য পূরণে সফল হবেন না। তাকে সাহসী হতে হবে, কারণ বহু বছর পরে তিনি মিশরে ফিরছেন এবং সেইসাথে তিনি একজন অপরাধীও ছিলেন, যাকে সবাই খুঁজে ফিরছিল। তিনি পেছনে যা ফেলে এসেছেন এবং ভবিষ্যতে তিনি যেসব জিনিসের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন, তাঁর জন্য পূর্ণ সাহস ও শক্তির প্রয়োজন।

কুর'আন নাযিলের উদ্দেশ্য হলো: আমাদের কাঁধ থেকে বোঝা অপসারণ করা এবং আমাদের বিষয়গুলি সহজ করা, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা আমাদের রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)-কে শিক্ষা দিয়েছেন:

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي

'এবং আমার কাজ সহজ করে দেন।'

- সূরা ত্বোয়াহা, ২০:২৬

দু'আর দ্বিতীয় অংশ

মুসা (আ.) যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে, এমন পরিস্থিতির মধ্যে তাঁর পক্ষে কাজ করা অসম্ভব। আসুন ওই বিষয়গুলি একটু দেখে নিই:

১. নির্মম অত্যাচারী সৈন্যদের দ্বারা ব্যাপকভাবে সুরক্ষিত মিশর শহরে প্রবেশ করা।

২. যেহেতু তিনি অনেক বছর পর ফিরছেন, তাই সেখানকার মানুষদের নতুন মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি সচেতন নন।

৩. ভুল করে তিনি যে হত্যাকাণ্ড করেছেন, সেজন্য তিনি একজন ফেরারি অপরাধী ছিলেন।

৪. এরপর তাকে সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা 'রাজপ্রাসাদে' প্রবেশ করতে হবে।

৫. প্রাসাদটিসহ পুরো শহরটিতে প্রচুর পাহারাদার নিযুক্ত রয়েছে।

৬. তাঁর সাথে তাঁর আপন ভাই ছাড়া অন্য কোনো সেনাবাহিনী ছিল না।

৭. তাকে ফেরাউনের প্রাসাদে প্রবেশ করতে হবে, যা পৃথিবীর সবচেয়ে সুরক্ষিত প্রাসাদ।

মুসা (আ.) জানতেন, আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা ব্যতীত এসব কাজ একেবারে অসম্ভব। কেবলমাত্র আল্লাহই পারেন মুসা (আ.)-কে সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়ে তাঁর কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌছে দিতে।

শিক্ষা

আমরা যদি কোনো ভাল কাজ করতে যাই এবং তাঁর সামনে যদি এমন প্রতিবন্ধকতা দেখতে পাই, যা দূর করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, তখন এই দু'আ ওইসেব প্রতিবন্ধকতা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। যখন আপনার অন্তরে নুর (আলো), স্বস্তি ও এই ঈমান রয়েছে যে, আল্লাহ আপনার সাথে আছেন, তখন সবকিছু আপনার সহজ ও অর্জনযোগ্য হয়ে ওঠে:

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي

'আর আমার জিহবার জড়তা দূর করে দেন।'

- সূরা ত্বোয়াহা, ২০:২৭

দু'আর তৃতীয় অংশ

মুসা (আ.) তোতলা ছিলেন, তিনি তাঁর এই ব্যক্তিগত সমস্যা সম্পর্কে জানতেন যে, এটা তাঁর সব থেকে বড় দুর্বলতা। বিশেষ করে যখন তিনি হতাশ হতেন বা রেগে যেতেন, তখনই তাঁর তোতলামির সমস্যাটি আরও বেশি তীব্র হয়ে উঠতো। অন্য সকল সমস্যা তিনি দূর করতে পারেন, কিন্তু এর এই সমস্যাটি দাওয়াতি মিশন তথা আল্লাহর কালাম ও বার্তা মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই তিনি আল্লাহর কাছে নিজের জিহ্বার জড়তা দূর করার জন্য দু'আ করেন। তিনি ভালভাবেই জানতেন, তিনি যদি স্পষ্টভাষী না হন, তবে ফেরাউন ও তার বাহিনীর কাছে আল্লাহর বাণী পৌছানোর যে মিশন তাকে দেওয়া হয়েছে, তিনি তা মিশনটি সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হবেন না।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট

মজার বিষয় হচ্ছে: মুসা (আ.) ইতিমধ্যে তাঁর তোতলামির সমস্যার সমাধান করেন, যখন তিনি আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা-র কাছে স্বীয় বক্ষ প্রশস্ত করার প্রথম দু'আ করেছিলেন। যখন তাঁর অন্তর প্রদত্ত স্বস্তি, প্রশান্তি ও সাহসিকতার দিকে প্রসারিত হবে, তখন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় না তিনি বিরক্ত হবেন, আর না মেজাজ হারাবেন এবং না তাঁর বক্তব্যে থাকবে জড়তা।

আমাদের এটা মনে রাখা আবশ্যক যে, মুসার (আ.) ভাষা জ্ঞানে বেশ দক্ষ ছিলেন। প্রাসাদে বেড়ে ওঠার সময় তিনি প্রাচীন মিশরীয় ভাষা রপ্ত করেন। প্রাসাদের বাইরে তিনি তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের সাহায্যে সময় দিতেন, তাই স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, তিনি বনি ইসরাইলের হিব্রু ভাষা শিখেছিলেন। যখন তিনি মিশর ছেড়ে পালিয়ে মাদিয়ানে তাঁর স্ত্রীর সাথে শ্বশুরবাড়িতে বসতি স্থাপন করেন, তখন তিনি তাদের ব্যবহৃত আরবি ভাষা আয়ত্ত করেন। এখান থেকে আমাদের নিকট স্পষ্ট যে, তাঁর জন্য ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগের বিষয়টি বিশেষ কিছু ছিল না, বরং তাঁর মূল উদ্বেগ ছিল: তিনি যে বার্তা পৌঁছাচ্ছেন, তা কার্যকর হচ্ছে কিনা এবং তিনি যে কথা বলছেন, তা স্পষ্ট হচ্ছে কিনা।

'উক্বদাতান' عُقْدَةً শব্দ নিয়ে পর্যালোচনা

এই শব্দের বিভিন্ন অর্থের মাঝে একটি অর্থ হচ্ছে: গিঁট বা জট পাকানো, যা এখানে সন্দেহের প্রতিনিধিত্ব করছে। যখন অনেকগুলি তাঁর একসাথে জট পাকানো অবস্থায় থাকে, তখন কোন তারটি কোথায় আছে, তা নির্ণয় করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। ঠিক এমনটি বক্তব্য দেওয়ার সময় ঘটতে পারে, যদি আপনি আপনার বক্তব্যের চরম মুহূর্তে থাকেন এবং গোটা জনতা আপনার দিকে চক্ষু নিবদ্ধ রাখে, সেরূপ পরিস্থিতিতে (অনেক সময়) আলোচনার বিন্যাস আপনার মাথা থেকে হারিয়ে যায় এবং কোনো কাঠামো ছাড়াই বক্তব্য সমাপ্ত করতে আপনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন, যার ফলে শ্রোতাদের নিকট আপনার বক্তব্য বোধগম্য হয় না।

মুসা (আ.) আল্লাহর কাছে এই দু'আ করেছিলেন যে, তিনি যেন পরিষ্কার উচ্চারণে বক্তব্য দিতে পারেন, কেবল তা নং, বরং সেইসাথে তিনি যখন বক্তব্য উপস্থাপন করবেন, তা যেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বোধগম্য হয়।

বক্তব্য পুরো জায়গা জুড়ে নয় সুবিন্যস্ত হওয়া উচিত, যাতে বক্তব্যে কোনো ধরনের জট বা অস্পষ্টতা তৈরি না হয়। তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করেন, যাতে তিনি তাঁর চারপাশের শ্রেতাদেরকে অনুরিত করতে পারেন এবং তাদেরকে নিকট নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করতে পারেন।

يَفْقَهُوا قَوْلِي

'যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।' -
সূরা ত্বোয়াহা, ২০:২৮

দু'আর চতুর্থ অংশ

নবী মুসা (আ.) আল্লাহর কাছে এই দু'আ করেন, কারণ তিনি অবগত ছিলেন যে, তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বক্তব্য দিতে পারেন না এবং বক্তব্য দানে তিনি বেশ ধীর ছিলেন। তিনি জানতেন, নবী হিসেবে ফেরাউন ও তাঁর সভাসদদেরকে প্রভাবিত করতে তাকে অবশ্যই সাবলীলভাবে কথা বলতে হবে। আমরা জানি, বক্তব্য সাবলীল হওয়ার পাশাপাশি সেটা অবশ্যই সুসংহত ও কার্যকর হতে হবে এবং তা শ্রোতাদের দ্বারা ওই বক্তব্য গভীরভাবে বোধগম্য হতে হবে।

যখন আমরা কারো সাথে কথা বলি, ধরি আমরা কোনো প্রবীণ ব্যক্তির সাথে কথা বলছি, তখন আমরা এটা নিশ্চিত করি যে, আমরা ওই প্রবীণ ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে সক্ষম। আমরা এমন ভাষা ব্যবহার করি, এমন ঢংয়ে কথা বলি এবং এমনভাবে বক্তব্য গঠন করি, যাতে তিনি আমাদের কথা বুঝতে পারেন। যখন আমরা লোকেদের সম্বোধন করে কথা বলি, তখন কতগুলো বিশেষ দিক রয়েছে, যা আমাদের মনে রাখা উচিত এবং সেগুলো হলো:

- শ্রোতা (বয়স, লিঙ্গ)
- বোঝার ক্ষমতা (জ্ঞান, যোগ্যতা)
- বক্তব্যের যথার্থতা (কাঠামো, বিন্যাস)
- প্রেক্ষাপট (জাতি, ভাষা, ধর্ম)

যখন আমাদের প্রয়োজন আমাদের এসব দুর্বল কাটিয়ে উঠা এবং স্পষ্ট ও বোধগম্যতার সাথে যোগাযোগ করা, তখন আমাদের উচিত নবী মুসার (আ.) করা এই অপূর্ব দু'আর সর্বোত্তম ব্যবহার।

৫.

এই সময়ের মধ্যে মুসা (আ.) প্রকাশ্যে ফেরাউনকে অপমান করেন এবং সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সে মিথ্যাবাদী এবং সমাজে এক প্রকারের বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান। জেনারেলরা ফেরাউনের কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছে এবং মুসা (আ.) তাদের রাজ্যে যে ধরনের হুমকি হয়ে উঠেছে, তা সামাল দিতে সে যোগ্য নয়। তাই তারা গোপন বৈঠক ডাকে এবং সেখানে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা নিজেরাই এই বিষয়টির দেখভাল করবে এবং মুসা (আ.)-কে হত্যা করবে। এর মাধ্যমে তারা সাম্রাজ্যের হুমকিকে বিনাশ করবে, যেহেতু শহর ও জনগণের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়াটা তাদের জন্য আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

ফেরাউনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা ছিল, নিরাপত্তা জোরদার করা এবং মুসা (আ.) তাঁর সাম্রাজ্য ও শাসনের উপর যে হুমকি চাপিয়েছে, তাঁর প্রতিকার করা। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মুসার (আ.) প্রতি তাঁর যে ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণে সে মুসাকে আঘাত করতে চাচ্ছিলো না। কারণ, সে নিজের সন্তানের মতো করে মুসা (আ.)-কে প্রাসাদে লালন-পালন করে। এরূপ পরিস্থিতিতে ফেরাউন এক চ্যালেঞ্জিং সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হয়:
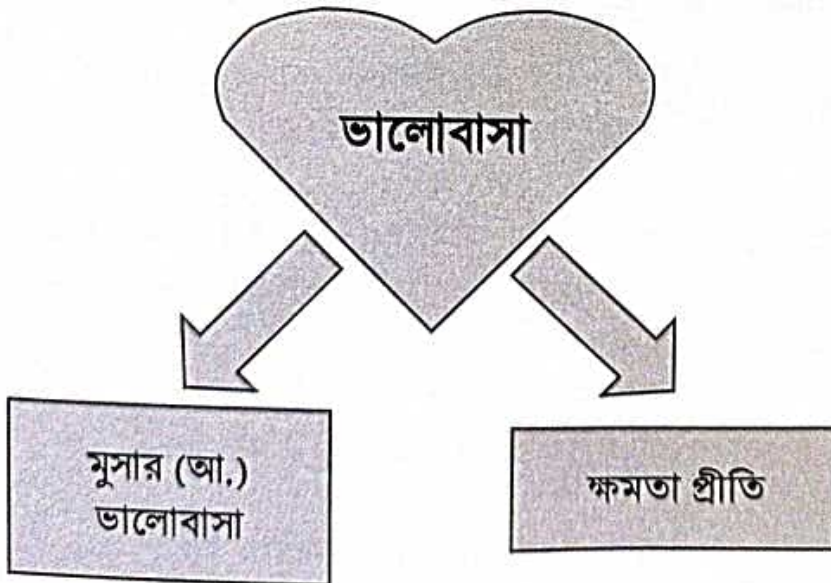
ক্ষমতার লোভ অথবা মুসার (আ.) প্রতি তাঁর যে স্নেহ রয়েছে, তার মধ্য থেকে যেকোন একটি ফেরাউনকে বাছাই করতে হবে। নিশ্চিতভাবে ফেরাউন গদিকে ভালবাসতো, তাই সে ক্ষমতাকে বেছে নেয় এবং মুসার (আ.) জন্য মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করে। সে তাঁর অভিজাত বাহিনীকে এই হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করার আদেশ দেয়। এক জালিম রাজা কিনা কেবল একজন মানুষকে হত্যার জন্য নিজের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনীকে আদেশ দেয়, যা থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ নেই। কেননা, একজনের বিরুদ্ধে যে হাজারো লোক ছুটছে।

আগেকার অবস্থা

পূর্বের ঘটনায় সৈন্যরা যখন মুসা (আ.)-কে হত্যা করার জন্য সদা প্রস্তুত ছিল, তখন মুসা (আ.) শহর ত্যাগ করে মাদিয়ানে আশ্রয় নেন। তিনি সেখানে বহু বছর অবস্থান করেন, সর্বোপরি গোটা সময় তিনি লুকিয়ে কাটান।

বর্তমান অবস্থা

এখনকার প্রেক্ষাপটে তিনি আর আত্মগোপনে নেই, বরং তিনি সকলের সামনে অবস্থান করছেন। তিনি ফেরাউনের সামনে থেকে তাঁর সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলছেন এবং না তিনি পালানোর পরিকল্পনা করছেন, আর না তিনি আত্মগোপনে যাবেন।

এমন পরিস্থিতিতে মুসা (আ.) আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে এই দু'আ করেন:

وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ
مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

'এবং মুসা বললো, যারা হিসাব-নিকাশ গ্রহণের দিনে বিশ্বাস রাখে না, এমন প্রত্যেক অহংকারী ব্যক্তি থেকে আমি আমার ও তোমাদের পালনকর্তার নিকট আশ্রয় নিয়েছি।'

- সূরা মু'মিন ৪০:২৭

এই দু'আটির মর্ম উপলব্ধির আগে আমাদেরকে প্রথমত কিছুটা আরবি ব্যাকরণ বুঝতে হবে। যখন আমরা কোনো সূরা তিলাওয়াত শুরু করি, তখন আমরা আল্লাহর নিরাপত্তা লাভের জন্য পাঠ করি:

أعوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ

'আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর
নিকট সুরক্ষা / আশ্রয় চাই।'

আউযু শব্দটি উয়াজ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ আপনি আপনার প্রিয় জীবন থেকে আল্লাহকে বেশি আঁকড়ে ধরে আছেন এবং তাঁকে ছেড়ে যেতে চান না। পাথরের উপর যেমন শ্যাওলা থাকে, গাছের ওপর থাকে ছত্রাক বা হাড়ের সাথে যেমনিভাবে মাংস আটকে থাকে, তেমনিভাবে আপনিও আল্লাহকে ছেড়ে যান না। শয়তানের মোকাবিলায় আপনি আল্লাহকে আঁকড়ে ধরে আছেন। কেননা, আপনি যদি আল্লাহকে ছেড়ে যান, তবে আপনি নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হবেন, এ কথা আপনি ভাল করেই জানেন।

দু'আতে মুসা (আ.) অতীতকাল ব্যবহার করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, এটা তাঁর প্রথম দু'আ নয়, যেখানে তিনি আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাচ্ছেন। মিশর থেকে পালানোর সময় তিনি আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চান এবং ওই সময় থেকেই তিনি আল্লাহকে আঁকড়ে ধরে আছেন এবং আল্লাহও তাকে সুরক্ষা দিয়ে আসছেন।

মুসা (আ.) তাঁর দু'আর মাধ্যমে ফেরাউন ও তাঁর সেনাপতিদের দেখাতে চেয়েছিলেন যে, তাদের নিকট যতই প্রবল ক্ষমতা ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী থাকুক না কেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে তাঁর যে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে, তাঁর কাছে এগুলো একেবারেই তুচ্ছ। মুসা (আ.) আল্লাহর সুরক্ষায় আছেন, তাই তিনি এখন আর হুমকি ও মৃত্যুর পরোয়ানাতে ভীত নন।

দু'আর মর্ম উপলব্ধি

মুসা (আ.) 'আমার রব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যা বলে দিচ্ছে যে, প্রভু হিসেবে সকল কর্তৃত্বের অধিকারী কেবল আল্লাহ এবং তিনি শুধু তাঁর দাস মাত্র। যত যাই হোক না কেন তাঁর প্রতিপালক তাকে মিশরের মাটিতে থাকার আদেশ দিয়েছেন, তাই তিনি এই মাটি আঁকড়ে থাকবেন এবং এখান থেকে পালাবেন না।

মুসা (আ.) ফেরাউনকেও বলেন, 'তুমি কি আমাকে আক্রমণের কথা ভেবেছিলে?' আল্লাহ তোমার ও তোমার সৈন্যবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনিও তোমার রব (প্রতিপালক)। এই কথাটি ফেরাউনের রাগকে আরও প্রশমিত করে, যেহেতু সে নিজেকে 'রব' (প্রতিপালক) হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল। এই দু'আর মাধ্যমে মুসা (আ.) প্রকৃতপক্ষে ফেরাউনের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়েন। এতে করে ফেরাউন আরও বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে, অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলার মদদ ও তাঁর উপর শক্ত ঈমানের কারণে মুসা (আ.) আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেন।

শিক্ষা (বৈশ্বিক ভাষা)

১. মুসা (আ.) দু'আতে ফেরাউনের নাম ব্যবহার না করে বিষয়টি সাধারণ রাখেন। এমনটি করে এই দু'আতে তিনি ওইসব লোককে অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা নিজেকে নিয়ে ব্যাপকভাবে গর্বিত ও অহংকারী। যাতে অন্যরা এই দু'আ থেকে শিখতে পারে এবং তা ব্যবহার করতে পারে। আমরা সবাই আমাদের জীবনে কোনো না কোনো ফেরাউনের মুখোমুখি হই এবং সেসব ক্ষেত্রে আমরা এই দু'আর সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারি।

২. সাহায্যের জন্য আল্লাহকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ তা'আলা (সবকিছুর) মালিক এবং আমরা সকলে তাঁর বান্দা, এই ঘোষণার মাধ্যমে মুসা (আ.) এটা দেখিয়ে দেন যে, আল্লাহ তা'আলাই ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র সত্তা।

৩. মুসার (আ.) দৃষ্টিতে ফেরাউনের কোনো সম্মান নেই, এ কারণে তিনি এই দু'আতে ফেরাউনের নামও উল্লেখ করেননি, বরং তাকে একজন অহংকারী হিসেবেই উল্লেখ করেছেন।

৪. আমাদের উচিত আমাদের দু'আগুলিতে মানুষের নাম উল্লেখ না করে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

অহংকার - মুতাকাব্বির

কেউ যদি মুতাকাব্বির তথা অহংকারী হয়, তখন বিচার দিবস সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা থাকে না। সে এমন এক দুনিয়াতে বাস করে, যেখানে সে এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকে যে, সে যেসব অন্যায় করেছে এবং তাঁর দ্বারা অন্যরা যে ধরনের কষ্ট ও দুর্ভোগের মুখোমুখি হয়েছে, তাঁর জন্য তাকে কোনো বিচারের সম্মুখীন হতে হবে না। এ ধরনের অহংকারী ও পথচ্যুত মানুষগুলো যেন আমাদেরকে আতংকিত না করে। বরং আমাদের উচিত আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করা এবং এসব ক্ষেত্রে আমাদের ভয় বা আতংকিত হওয়ার কিছু নেই, যেহেতু আল্লাহ ঈমানদারদেরকে এসব বিভ্রান্ত ও অহংকারীদের থেকে সুরক্ষিত রাখেন।
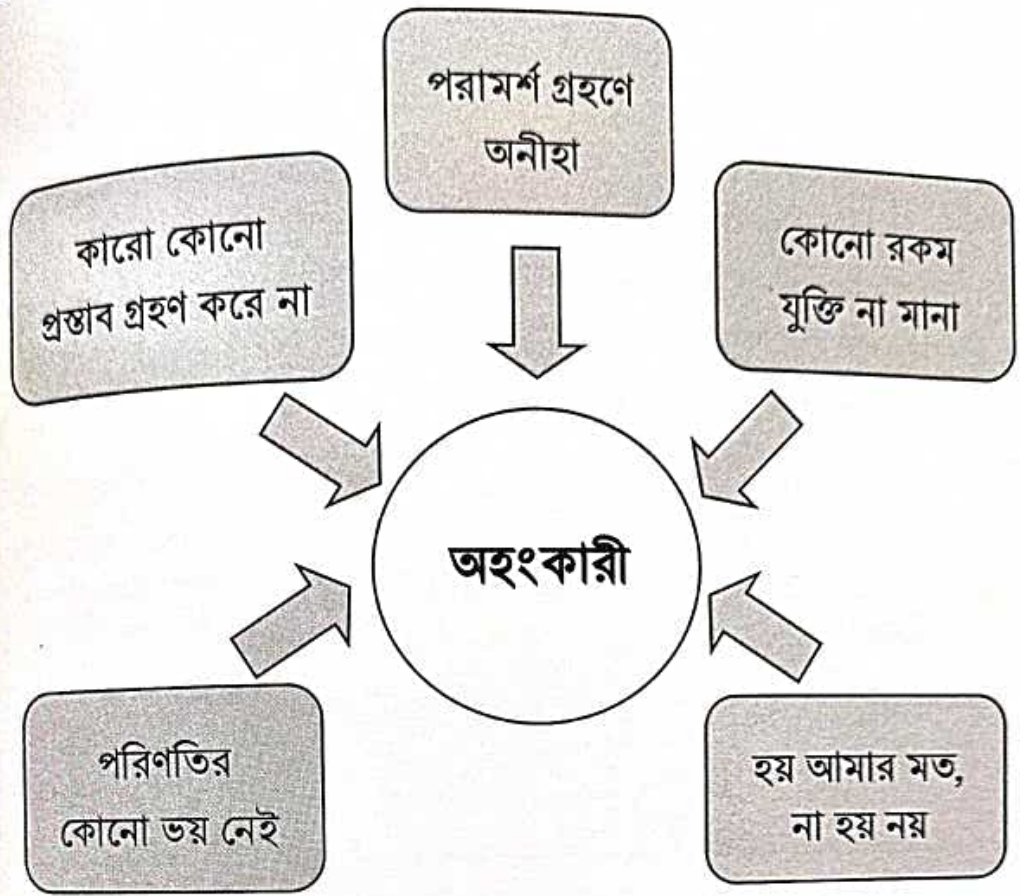
গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

দু'আর শক্তি বা এর গুরুত্বকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। কেননা, যেখানে একজন ব্যক্তিকে পরাস্ত করতে গিয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনী পর্যন্ত ব্যর্থ হয়, শুধুমাত্র এই কারণে যে, আল্লাহ ওই একজন ব্যক্তিকে রক্ষা করেন এবং ওই দাম্ভিকদেরকে ধ্বংস করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ পাঠাতে থাকেন, যা ফেরাউনের বাহিনীকে দুর্যোগ মোকাবিলা ও শহর পুনর্নির্মাণে ব্যস্ত রাখে। শেষমেশ আল্লাহ ফেরাউনের সেনাবাহিনীর সবাইকে সমুদ্রে ডুবিয়ে চিরতরে ধ্বংস করে দেন।

৬.

মুসা (আ.) ও বনি ইসরাইলের লোকেরা মিশর থেকে হিজরত করে, অন্যদিকে ফেরাউন ও তাঁর শক্তিশালী বাহিনীকে সমুদ্রে ডুবিয়ে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করেন। পরবর্তী দু'আতে যাওয়ার আগে এবং মুসার (আ.) পরবর্তী দু'আ সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা পেতে আমাদেরকে প্রথমত বিষয় পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। আসুন চিত্রটি দেখি:

মুজিজা (১):

ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনীর সামনে মুসা (আ.) আল্লাহ প্রদত্ত মুজিজা প্রদর্শন করেন। মুসার (আ.) লাঠি সাপে রূপান্তরিত হয়।

(দু'আর শক্তি)

মুসার (আ.) জন্য ফেরাউন মৃত্যুর যে পরোয়ানা জারি করে, তা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মুসা (আ.) আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে দু'আ করেন।

(প্রাকৃতিক বিপর্যয়)

আল্লাহ *সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা* মুসার (আ.) দু'আ কবুল করেন এবং তাকে রক্ষার জন্য একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ পাঠাতে থাকেন, যা ফেরাউনের বাহিনীকে দুর্যোগ মোকাবিলা ও শহর পুনর্নির্মাণে ব্যস্ত রাখে।

(মিশর থেকে পলায়ন)

মুসা (আ.) তার সম্প্রদায় বনি ইসরাইলকে নিয়ে মরুভূমির দিকে রওনা হন এবং লোহিত সাগরের সামনে থেমে যান, আর তাদের পেছনেই ছিল ফেরাউনের শক্তিশালী বাহিনী।

মুজিজা (২):

আল্লাহ মুসা (আ.)-কে তার লাঠি দিয়ে সমুদ্রের পানি আঘাতের নির্দেশ দেন এবং এতে সমুদ্র পৃথক হয়ে তা অতিক্রমের পথ তৈরি করে দেয়।

(ধ্বংস)

আল্লাহ ফেরাউন ও তার বাহিনীকে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে দিয়ে তাদের সকলকে চিরতরে বিনাশ করে দেন।

যেমনটি আমরা উপরের চিত্রগুলোতে দেখতে পাচ্ছি, একের পর এক ঘটনা ঘটেছে, আল্লাহ তা'আলা বনি ইসরাইল জাতিকে আশা ও অসংখ্য মুজিজা দ্বারা আচ্ছাদিত করে রেখেছেন, এমনকি ফেরাউনের মতো জালিম শাসকের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন। তারা নিজেদের চোখের সামনে ওই ব্যক্তিকে ডুবে যেতে দেখে, যে নিজেকে রব (প্রতিপালক) বলে দাবি করেছিল। এ সময় যদি এমন কেউ থাকতো, যাদের অন্তরে সামান্য পরিমাণ সন্দেহ বিদ্যমান ছিল, তবে তাদের যাবতীয় সন্দেহ দূরে হয়ে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠতো যে, মুসা (আ.) আল্লাহর সত্য রাসূল এবং কেবল আল্লাহরই ইবাদাত করা উচিত।

দাসত্ব ও অত্যাচার থেকে মুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই বনি ইসরাইলের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে প্রদান করা মুজিজা শেষ হয়ে যায়নি। আল্লাহ তাদের

জন্য আরও মুজিজা প্রেরণ করেন এবং আসমানি সহায়তা অব্যাহত রাখেন। কিভাবে আল্লাহ তাদেরকে অনুর্বর প্রান্তরে উত্তাপ, ক্ষুৎ-পিপাসা থেকে রক্ষা করলেন, তাঁর চিত্র দেখি,
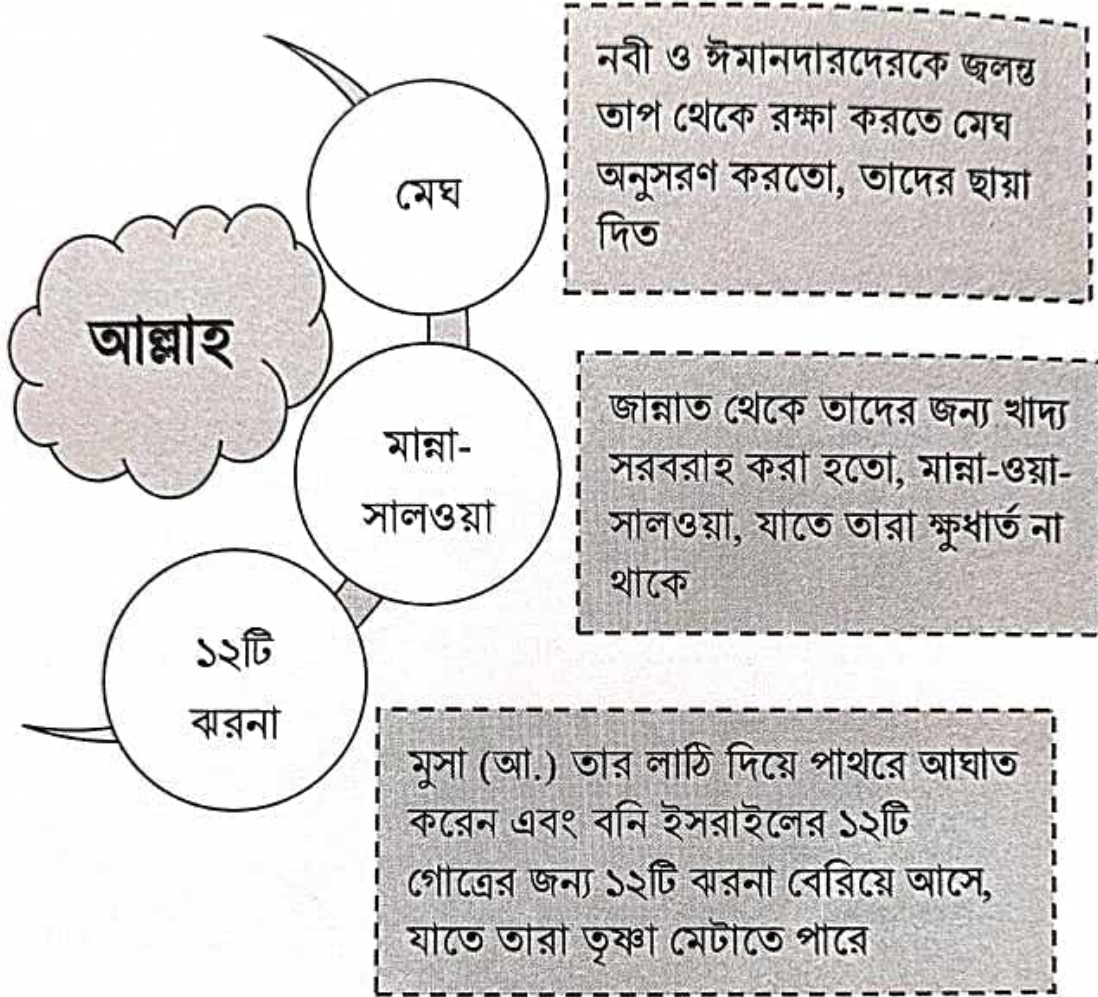
বনি ইসরাইলদের জন্য বহু মুজিজা প্রেরণ করা হয় এবং মুসার (আ.) মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অনেক উপহারের সাক্ষী বানান। কিন্তু এতসব মুজিজা ও নিয়ামত ভোগের পরেও তারা পথচ্যুত হয়ে পড়ে এবং মিশরে থাকা অবস্থায় তারা যেসব পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত ছিল, সেগুলোকে তারা তাদের গোত্রে চালু করতে থাকে। হারুনের (আ.) পথ-নির্দেশনা ও সাবধান বাণী সত্ত্বেও তারা উপাসনার জন্য স্বর্ণ দিয়ে একটি গরু তৈরি করে। মুসা (আ.) যখন তাঁর যাত্রা থেকে ফিরে আসেন, তখন তিনি তাদের এমন অশোভন আচরণ দেখে খুবই রেগে যান। তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ তাদেরকে যে অনুগ্রহ দান করেছিলেন, তা তারা বেমালুম ভুলে যায়।

যে ঘটনা মুসা (আ.)-কে দু'আ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল

আল্লাহর আদেশ হিসেবে মুসা (আ.) যখন তাঁর জাতিকে কোনো কাজের আদেশ দিতেন, তখন কেউ কেউ তাঁর উদ্দেশ্যে নানা ধরনের অযৌক্তিকভাবে প্রশ্ন ছুড়ে দিত। এরূপ একটি ঘটনা হলো, একবার একটি হত্যাকাণ্ড ঘটে এবং কে এই হত্যার সাথে জড়িত, তা জানার জন্য তারা মুসার (আ.) কাছে আসে। মুসা (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি লাভ করলেন এবং তিনি তাদেরকে একটি গাভী জবাই করার আদেশ দিলেন। ইতিপূর্বে নিজেদের চোখে এতসব মুজিজা প্রত্যক্ষ করা, মুসার (আ.) শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি দেখা এবং তিনি যে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, তা অবগত থাকাকালে যেখানে তাদের উচিত ছিল অবনত মস্তকে তাঁর আদেশ মেনে নেওয়া, সেখানে তারা অত্যন্ত অভদ্র ও অশালীনভাবে উত্তর দেয়। তারা বলে:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

'মুসা যখন তাঁর নিজ সম্প্রদায়কে বলে, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু জবাই করতে আদেশ করেছেন। তখন তারা বলে, তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছো? তিনি বললেন, জাহিল বা অজ্ঞদের দলে শামিল হওয়া থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।' - সূরা বাকারাহ, ২:৬৭

যেমনটি আমরা জানি, মুসা (আ.) রাগী স্বভাবের ছিলেন, যখন কোনো ভুল, অন্যায় ও অবিচার দেখতেন, তৎক্ষণাৎ রেগে আগুনের মতো জ্বলে উঠতেন। এখন তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের লোক, যাদের উপর তাঁর কর্তৃত্ব রয়েছে, তারা আল্লাহ তা'আলার দেওয়া আদেশগুলি নিয়ে প্রশ্ন করা ও অবজ্ঞা করা শুরু করেছে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, যাদের উপর আপনার কর্তৃত্ব রয়েছে, তারা যখন তাদের সীমা অতিক্রমে করে, তখন আপনি তাদেরকে তাদের উপযুক্ত স্থানে নিয়ে আসতে চেষ্টা চালাবেন। কিন্তু মুসা (আ.) তেমনটি করেননি, এর পরিবর্তে তিনি আল্লাহর নিকট এক তাৎপর্যমূলক দু'আ করেন:

قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

তিনি (মুসা) বললেন, জাহিল বা অজ্ঞদের দলে শামিল হওয়া থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

মুসা (আ.) চাইলেই খুব সহজে তাদেরকে তাদের উপযুক্ত স্থানে নিয়ে আসতে পারতেন, কিন্তু তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, তাদের থেকে তাঁর সুরক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন নেই, বরং তাঁর প্রয়োজন স্বীয় প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখা। তাঁর মাঝে বিস্ফোরক প্রকৃতির যে মনোভাব রয়েছে, তিনি চাননি সেটাকে উদগীরণ করে নিজের বিনয় ও ধৈর্যশক্তিতে বিনষ্ট করতে।

আল্লাহ *সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা*-র কাছ দু' ধরনের সুরক্ষা চাওয়ার রয়েছে:

শিক্ষা

আকিল (সুস্থ ও স্বাভাবিক চিন্তার অধিকারী)

যৌক্তিক প্রক্রিয়াটি আপনার মনের সঠিক জায়গায় রয়েছে, আপনি আপনার বক্তব্য, আপনার ক্রিয়াকর্ম এবং আপনার চিন্তন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আপনি বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত নেন এবং নিজের বিনয় ও ধৈর্যকে আপনি ধরে রাখতে পারেন।

জাহিল (অজ্ঞ, সুস্থ চিন্তার নিয়ন্ত্রণ যে হারিয়েছে)

আপনি নিজের বোধশক্তির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন, আপনার মনের সবকিছু তালগোল পাকিয়েছে, কারণ আপনি আবেগ ও ক্রোধে পূর্ণ। যখন আপনি এমন হন, তখন আপনার বক্তব্য এবং কর্মের উপর আপনি নিজের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন না এবং আপনি নিজেকে হাসির পাত্রে পরিণত করেন।

যিনি খুব দ্রত নিজের মেজাজ হারিয়ে ফেলেন, তাঁর উচিত এই দু'আটি ব্যবহার করা, যেন তিনি সোজা চিন্তা ও সঠিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা না হারানোর ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে পারেন। যখন আপনার আবেগ ও চিন্তার উপর আপনার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না, তখন আপনি সহজেই পরাজিত হয়ে যান।

প্রকৃতপক্ষে এটা এক মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ এবং কিভাবে এই যুদ্ধ জয় করতে হয়, তা মুসা (আ.) ভালভাবেই জানতেন। তিনি জানতেন, এই যুদ্ধে জিততে হলে তাকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিতে হবে, যাতে তিনি এমন মানুষদের দলে শামিল না হন, যারা নিজেদেরকে বোকা প্রমাণ করে।

নবী মুসার (আ.) এ সকল দু'আ থেকে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উত্তম উপদেশ গ্রহণের তাওফিক দান করুন। আমিন।

নবী সুলাইমানের (আ.) দু'আ

নবী সুলাইমান (আ.) নবী দাউদের (আ.) পুত্র। পিতা-পুত্র দুজনকেই আল্লাহ তা'আলা হিকমত (প্রজ্ঞা) দান করেছেন এবং তারা ন্যায় ও করুণার সাথে রাজ্য শাসন করেছিল। আল্লাহ তা'আলা নবী সুলাইমান (আ.)-কে বহু অনুগ্রহ এবং যোগ্যতা দান করেন। নিম্নের ডায়াগ্রামটি দেখুন:
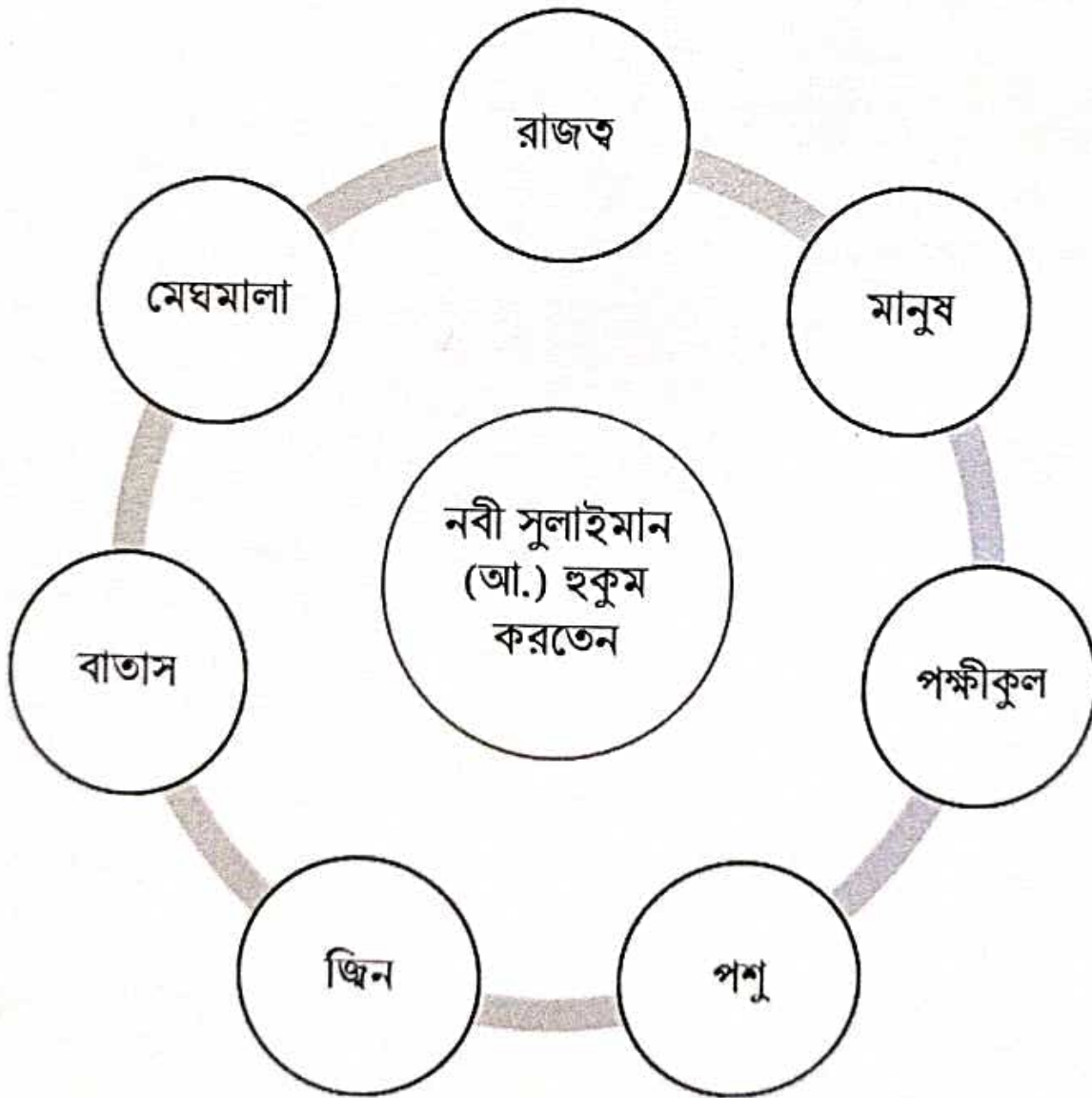
সুলাইমান (আ.) অল্প সংখ্যক নবীদের মাঝে ছিলেন, যারা বেশ ধনসম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে এমন এক রাজ্যের প্রার্থনা করেন, যা তাঁর পরে আর কারও হবে না। আল্লাহ তাকে শাসন করার জন্য এমনই এক রাজত্ব দান করেন। পশু-পাখি, মেঘ, বাতাস এমনকি জ্বিনদেরকেও তা অধীনস্থ করে দেওয়া হয়। সুলাইমান (আ.) মানুষ, পশুপাখি ও জ্বিনদেরও নেতা ছিলেন। তাকে পশুপাখিদের ভাষা বোঝার ক্ষমতা দান করা হয়।

একটি পিঁপড়ার গল্প

ওই সময় একটি পিঁপড়া ছিল এবং বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, পিঁপড়াটি বহু সুন্দর গুণ ধারণ করতো এবং সে তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য বেশ সহায়ক ও হিতকর ছিল। প্রতিনিয়ত সে তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের প্রয়োজন মেটাতো।
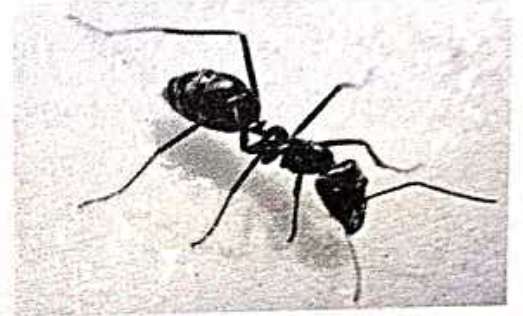
একদিন সুলাইমান (আ.) তাঁর জ্বিন, মানুষ ও পক্ষীদের সমন্বয়ে গঠিত সৈন্যদল একত্র করে। পিঁপড়ার উপত্যকার দিকে কঠোর শৃঙ্খলার সাথে তারা এগিয়ে যেতে থাকে। তারা যদি পিঁপড়াদের বাসা পদদলিত করে, তবে তা গোটা পিঁপড়া সম্প্রদায়ের জন্য মহাবিপর্যয়ের কারণ হবে।

ওই পিঁপড়াটি সেনাদলের আগমন শুনতে পায়। সে এ ব্যাপারে সচেতন ছিল যে, সবচেয়ে ছোট পতঙ্গ হওয়ার কারণে প্রায়শই লোকেরা পিঁপড়াদেরকে উপেক্ষা করে থাকে, যেহেতু তারা খুব কমই চোখে পড়ে। এত বড় সেনাবাহিনী এবং তাদের ভারবাহী পশুগুলো এই এলাকা দিয়ে যাবে। সে জানতো, সুলাইমান (আ.) ও তাঁর সৈন্যবাহিনীরা সম্ভবত তাদেরকে পদদলিত করবে। তাই সে দেরী না করে নিজ সম্প্রদায়কে মহা-দুর্যোগের ব্যাপারে সতর্ক করে এবং তাদেরকে নিরাপদে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দেয়:

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا
مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

'যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছায়, তখন এক পিপীলিকা বললো, হে পিপীলিকার দল! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ করো, অন্যথায় সুলাইমান ও তাঁর বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করবে।'

- সূরা নমল, ২৭:১৮

আল্লাহ তা'আলা ক্ষুদ্র এই পিঁপড়ার আবেদন অত্যন্ত শ্রুতিমধুর করে সেনাবাহিনীর কোলাহলপূর্ণ পদযাত্রার মাঝেও সুলাইমানের (আ.) কানে পৌঁছে দেন। সুলাইমান (আ.) ওই পিঁপড়ার ভাষা বুঝতে পারেন এবং তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি যে যে অনুগ্রহ ও নিয়ামত লাভ করেছেন, তাঁর জন্য শুকরিয়া আদায় করেন। তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে পথ পরিবর্তনের আদেশ দেন এবং এভাবে পিঁপড়া কলোনীর ধ্বংস এড়ানো হয়:

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

'পিঁপড়ের কথা শুনে সুলাইমান মুচকি হাসেন এবং বলেন, 'হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে সামর্থ্য দেন, যেন আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে যে নিয়ামত দান করেছেন, তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে পারি; যেন আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকাজ করতে পারি। (হে আমার প্রতিপালক) আমাকে আপনি আপনার নিজ অনুগ্রহে আপনার সৎ ইবাদাতগুজার বান্দাদের মাঝে শামিল করুন।'

- সূরা নমল, ২৭:১৯

নবী সুলাইমান (আ.)-কে আল্লাহ এমন এক রাজ্যত্ব দেন, যা তার আগের বা পরের আর কোনো নবী ও রাসূলকে দেওয়া হয়নি। গাছপালায় বসবাসকারী বহু প্রাণীর উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং তিনি তাদেরকে যে আদেশ দিতেন, তারা তা পালন করতো। এমন ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে এটা ভুলে যাওয়া খুব সহজ যে, এমন ক্ষমতা আল্লাহ প্রদত্ত এবং তিনি এই ক্ষমতা যেকোন সময় কেড়ে নিতে পারেন। নবী সুলাইমান (আ.) আল্লাহর প্রতি অত্যন্ত বিনয়ী ও কৃতজ্ঞ ছিলেন,

যা আমরা সূরা নমলে দেখতে পাই। যা আমাদের জন্য অনুসরণীয় এক শক্তিশালী বার্তার ন্যায়।

নবী সুলাইমানের (আ.) করা দু'আটিকে আরও গভীলভাবে উপলব্ধির জন্য একে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে,

দু'আর প্রথম অংশ: তিনি বললেন, 'হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে সামর্থ্য দেন'

- সবকিছুকে তার উপযুক্ত স্থানে জড়ো করা
- কাউকে সামনে এগিয়ে দেওয়া
- কাউকে কোন কিছু সম্পর্কে উৎসাহী করা

وْزِعْنِي (و ز ع) এর অর্থ: সকল সেনা তাদের পদক্রম অনুসারে একই সরলরেখায় আছে, এই বিষয়টি সৈন্যদলের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি নিশ্চিত করছে, যেন শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং কেউই পিছিয়ে না পড়ে।

নবী সুলাইমানের (আ.) কথার মর্মার্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, আমাকে যে পরিমাণ শক্তি ও সামর্থ্য দিয়েছেন, তার সবই আমাকে উপহার হিসেবে দিয়েছেন এবং আমি যেন এগুলোর জন্য আপনার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা আমি যেন আদায় করতে পারি, তার শক্তি আমাকে দেন। যা কিছু ঘটছে এবং সামনে ঘটবে, আমাকে তার কিছুই ভুলিয়ে দেবেন না।

নবী সুলাইমান (আ.) বিশাল রাজ্য তদারকি করতেন। তাঁর অধীনে ছিল জ্বিন, পশুপাখি, মেঘমালাসহ আরও অনেক কিছু। যখন আপনার কাঁধে বিশাল দায়িত্ব থাকে, তখন আপনার জন্য আল্লাহকে ভুলে যাওয়া সহজ, কারণ আপনি ভীষণ ব্যস্ত।

নবী সুলাইমান (আ.) আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনি আমাকে যে ক্ষমতা দান করেছেন, যে বাহিনীগুলি আমার অধীনস্থ করেছেন, যে সাম্রাজ্য আমাকে উপহার দিয়েছেন, এসবের চেয়ে আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আপনার

দেওয়া প্রতিটি অনুগ্রহের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া ও আপনার প্রতি পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করা। সুলাইমান (আ.) আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কনে এবং তিনি চান না এ ব্যাপারে কোনো উদাসীনতা প্রদর্শিত হোক। কেননা, তাঁর নিকট আল্লাপ প্রদত্ত প্রতিটি অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া আদায় করাটা অন্য সবকিছু থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

দু'আর দ্বিতীয় অংশ: নবী সুলাইমান (আ.) বলেন, (আপনি আমাকে সামর্থ্য দেন) যেন আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে যে নিয়ামত দান করেছেন, তার শুকরিয়া আদায় করতে পারি

আপনি আল্লাহ তা'আলার প্রতি কতটা কৃতজ্ঞ, তা জানার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে, যখন আপনি নিজেকে এই প্রশ্ন করেন যে, জন্মের পর থেকে আপনার পিতামাতা আপনার জন্য যত ভালো কাজ করেছে, তা যদি একটিও হয়ে থাকে, তবে তার স্বীকৃতি দেওয়া। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করার সাথে সাথেই পিতামাতার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এটা প্রদর্শন করছে যে, পিতামাতাকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেওয়াটা আমাদের জন্য আবশ্যক এবং তা এই দু'আর এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

নবী সুলাইমান (আ.) স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে, যখন তিনি শিশু ছিলেন, তখন তিনি কিছুই ছিলেন না। তাঁর পিতামাতাকে তাকে বড় করে তোলেন, যখন তিনি ছিলেন সবচেয়ে অসহায়। না তাঁর রাজত্ব ছিল, আর না ছিল অন্যের উপর তাঁর কোনো ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। আল্লাহ তাঁর পিতামাতাকে অনুগ্রহ করেছেন বলেই তাঁর

পক্ষে এতকিছুর অধিকারী হওয়া সম্ভব হয়েছে। এজন্য তিনি তাঁর পিতামাতাকে আশীর্বাদে ধন্য করার জন্য আল্লাহ তা'আলাকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন এবং তাঁর পিতামাতা তাঁর জন্য যা যা করেছেন, তাঁর স্বীকৃতি দান করছেন।

যখন আমাদের পিতামাতা বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং আমরা উপার্জন করতে শুরু করি, তখন প্রায়শই দেখা যায় তারা আমাদের প্রতি যত ইহসান করেছেন, তাঁর সবই আমরা ভুলে যাই। আমরা গর্ব করি ও অহংকারী হয়ে বলি যে, পিতামাতার উচিত উল্টো আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। অথচ সুলাইমান (আ.) বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ ও তাঁর পিতামাতার কতটা কৃতজ্ঞ।

দু'আর তৃতীয় অংশ: নবী সুলাইমান (আ.) বলেন, (আমাকে শক্তি দেন) যেন আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকাজ করতে পারি

- মানুষকে দান করুন এবং দৈহিক ও মানসিক সমর্থন দেন
- জাত, বর্ণ, পদমর্যাদা বিবেচনা না করে ভালো কাজ করা।
- ভাল কাজে উৎসাহ দেওয়া ও মন্দ কাজে নিষেধ করা এবং বিষয়াদির সমস্যা নিরূপণ করে তা ঠিক করা

যখন আল্লাহ আপনাকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেন এবং আপনি কয়েকটি রাজ্য ও প্রাণিকুলের অধিপতি হন, তখন দুর্নীতিপরায়ণ হওয়াটা বেশ সহজ। বলা হয়ে থাকে:

Power tends to corrupt; absolute
power corrupts absolutely

ক্ষমতা দুর্নীতির জন্ম দেয়; চরম ক্ষমতা
চরমভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত করে।

সাধারণত দেখা যায় যে, ক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে যেকোন মানুষের নীতি-নৈতিকতা বোধ কমতে থাকে - এ উক্তিটি ১৯শ শতকের ব্রিটিশ ঐতিহাসিক লর্ড অ্যাক্টনের।

সুলাইমান (আ.) বিষয়টি ঠিকই উপলব্ধি করেন, তাই তিনি আল্লাহর কাছে এই দু'আ করেন, যাতে রাজত্ব পাওয়া সত্ত্বেও সৎ কাজ করা থেকে তিনি গাফেল না হন। আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যই শক্তি, খ্যাতি, ধনসম্পদ ও ক্ষমতা দিয়ে থাকেন।

নবী সুলাইমান (আ.) ভালো করেই জানতেন যে, তিনি যতই ভালোকাজ করুন না কেন, তা যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য না হয়ে থাকে, তবে সবই মূল্যহীন। সৃষ্টির কল্যাণের জন্যই আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা নবী সুলাইমান (আ.)-কে ক্ষমতা দিয়েছেন, তাই তার উচিত হবে আল্লাহর যথাযথ শোকর আদায় করা। কেননা, আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া এসবের কিছুই সম্ভব ছিল না।

যখন আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সৎকাজ করি, তখন আমরা অনেক পরীক্ষা ও কঠোর যন্ত্রণার মুখোমুখি হই। কখনও কখনও আমরা আমাদের নিজের পরিবারের সদস্যদের দ্বারা সমালোচনা বা প্রশ্নের মুখোমুখি হই। বলা হয়, কেন আমরা নিজের ভবিষ্যত নিয়ে কাজ না করে অন্যকে সাহায্য করা বা মানুষের কল্যাণে নিজেদের সময় নষ্ট করছি। এমন সমালোচনা আমাদের উৎসাহকে নষ্ট করে দেয়। অন্যদিকে যখন আমরা ভাল কাজ করি, তখন যদি ইতিবাচক দৃষ্টিতে সেটাকে বিবেচনা করা হয়, স্বাভাবিকভাবেই আমরা ভালো কাজে আরও বেশি উৎসাহ বোধ করি। কিন্তু এটাও এক পর্যায়ে বিপদের কারণ হতে পারি, যদি আমরা আমাদের নিয়তকে পরিষ্কার না রাখি। যদি আমাদের ভালো কাজ করার পেছনে মানুষের উৎসাহ ও প্রশংসা লাভই মুখ্য হয়ে থাকে, তবে সবই মূল্যহীন।

এজন্য আমাদেরকে দুটো বিষয়কে সাবধানতার সাথে মোকাবিলা করতে হবে। আর সেটাকে মোকাবিলার একমাত্র পথ হলো: জীবনের সকল ভালো কাজকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা। তাতে মানুষ কি মনে করলো বা না করলো, তা যেন বিবেচ্য না হয়।

আপনি যদি রাস্তা থেকে আবর্জনা অপসারণও করেন, তবে তার উদ্দেশ্য যেন মানুষের বাহবা পাওয়া না হয়ে খালেসভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়; তবেই আপনার সৎ কাজ আল্লাহর দরবারে প্রতিদান লাভের উপযুক্ত হবে। আল্লাহ বলেন:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'যে সৎকর্ম করে এবং সে ঈমানদার, হোক সে পুরুষ কিংবা নারী, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করবো এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের প্রাপ্য পুরস্কার দেবো, যা তারা করতো।'

- সূরা নাহল, ১৬:৯৭

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.

'আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন, 'অন্ধকার রাতের ন্যায় ফিতনা আসার আগেই ভালো কাজগুলো দ্রুত করে ফেলো। কেননা, ওই সময় মানুষ সকালে ঈমান আনবে এবং সন্ধ্যা নাগাদ সে কাফের হয়ে যাবে কিংবা সন্ধ্যায় ঈমানদার থাকবে তো সকালে সে কাফের হয়ে যাবে এবং (ওই সময়) পার্থিব লাভের জন্য দ্বীনকে বিক্রি করা হবে।'

- সহিহ মুসলিম

رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা এজন্য যে, তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতো।'

- সূরা বায়্যিনাহ, ৯৮:৮

দু'আর চতুর্থ অংশ: নবী সুলাইমান বলেন, (হে আমার প্রতিপালক) আমাকে আপনি আপনার নিজ অনুগ্রহে আপনার সৎ ইবাদাতগুজার বান্দাদের মাঝে শামিল করুন
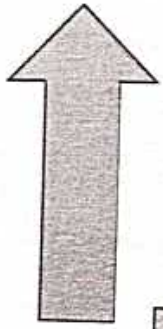
ধার্মিক মানুষ তার আশেপাশের মানুষের ঈমান বাড়াতে সহায়তা করে
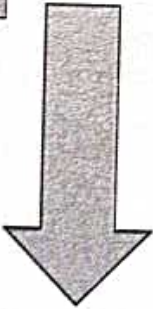
হযরত সুলাইমান (আ.) জানতেন যে, কৃতজ্ঞ হওয়ার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে: সৎকর্মপরায়ণ লোকদের দলভুক্ত হওয়া, এমনকি তা যদি একজন ব্যক্তিও হয়। এই বিশ্বে আমাদের যত মর্যাদা রয়েছে, আখিরাতে তার সবই মুছে ফেলা হবে এবং সেখানে আপনার সাথি হবে আপনার আমল এবং সৎ সাথি, যারা ওই ভয়াবহ দিনে আল্লাহর ইচ্ছায় আপনার জন্য সুপারিশ করবে।

আপনার সত্যিকার বন্ধু তারাই, যারা আপনাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে ও সহায়তা করে। নিজের কল্যাণের জন্য এমন বন্ধুদেরকে খুঁজে বের করুন। বিচার দিবসের মতো ভয়ানক দিনেও এমন ঈমানদার বন্ধুরাই আপনার উপকারে এগিয়ে আসবে। যেমনটি আমরা হাদিস থেকে জানতে পারি:

'মুমিনগণ পুলসিরাত পেরিয়ে যাবে এবং তাদের ভাইদের জন্য সুপারিশ করবে যারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। তারা বলবে, 'হে প্রভু, আমাদের ভাইয়েরা আমাদের সাথে নামাজ পড়তো এবং আমাদের সাথে রোজা রাখতো এবং আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতো।' আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, 'যাও, যাদের অন্তরে এক দিনার ওজন পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকে বের করে আনো' এবং আল্লাহ তাদের দেহকে আগুন দগ্ধ হওয়াকে নিষিদ্ধ করবেন। তাই তারা (জাহান্নাম থেকে) বেরুবে, তাদের মধ্যে কারও পা বা পায়ের পাতা পর্যন্ত আগুন থাকবে এবং তাদেরকে তাদের চেনা-পরিচিত মানুষদের সামনে নিয়ে আসা হবে। এরপর তারা ফিরে আসবে এবং আল্লাহ বলবেন, 'যাও, যার অন্তরে অর্ধ-দিনার পরিমাণ ঈমান খুঁজে পাও, তাকে সামনে নিয়ে আসো।' তারা যাবে এবং যাদেরকে তারা চিনতে পারবে তাদেরকে সামনে আনা হবে। এরপর তারা ফিরে আসবে এবং তিনি বলবেন, 'যাও, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে, তাকে বের করে আনো।' আর তারা যাবে এবং যাদেরকে চিনবে তাদেরকে তারা বের করে আনবে।

এমন মানুষদেরকে বন্ধু হিসেবে নির্বাচন করুন, যারা কিয়ামতের দিনে আল্লাহর আরশের ছায়ায় আপনার পাশে দাঁড়াবে। এমন বন্ধু খুঁজুন যারা আপনাকে ঈমানের দিকে নিয়ে যাবে এবং নিয়ে যাবে সোজা জান্নাতে।

যখন মানুষ একদল নেককার বন্ধুদের সাথে থাকে, তখন সে নিজেকে আরও বেশি ন্যায়পরায়ণ, তাকওয়াবান ও ধৈর্যশীল হিসেবে খুঁজে পাবে। কেননা, এমন পরিবেশে সকলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরে নেককাজে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। যখন দেখবেন আপনার বন্ধুরা বেশি বেশি দান-সাদাকাত করছে, তখন আপনিও পিছিয়ে থাকতে চাইবেন না। যখন দেখবেন তারা দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য সময় দিচ্ছে, তখন আপনিও তাতে শামিল হবেন। যখন তারা নিজেদেরকে কুর'আনের জন্য নিজেদের জীবন বিলিয়ে দেবে, তখন আপনিও তা করতে আরও বেশি করে উদ্বুদ্ধ হবেন। এজন্য নেককার বন্ধুর সঙ্গ ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এমন বন্ধুত্ব দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সাফল্য নিয়ে আসবে।

উস্তাদ নোমান আলী খান

উস্তাদ নোমান আলী খান বর্তমান সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় ইসলামী বক্তা এবং কুর'আনের আরবি ভাষাজ্ঞান সর্বসাধারণের কাছে অত্যন্ত সহজ ভাষায় তুলে ধরার জন্য সমধিক পরিচিত।

তুমুল জনপ্রিয় ও নন্দিত পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত এই কুর'আন গবেষক ১৯৭৮ সালে জার্মানিতে জন্ম গ্রহণ করেন।

সাধারণ পরিমণ্ডলে বড় হওয়া নোমান আলী খান এককালে নাস্তিকতার বেড়াজালে আটকে পড়লেও আল্লাহর মেহেরবাণীতে তিনি পুনরায় ইসলামে ফিরে আসেন এবং নতুন স্পৃহায় ইসলামের উচ্চতর জ্ঞান বিশেষ করে আরবি ভাষা রপ্ত করা ও কুর'আনের গভীর অধ্যয়নে নেমে পড়েন। সাধারণ ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ইসলামে ফিরে আসার কারণে তিনি বর্তমান যুগের চ্যালেঞ্জ এবং কি কি কারণে আজকের উচ্চশিক্ষিত যুবক ও যুবতীরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তা ভালো মতো ধরতে পারেন, আর এজন্য তাঁর আলোচনা ও বক্তব্যগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষিত সমাজকে বেশি নাড়া দেয়।

তাঁর শিক্ষকদের মাঝে ড. ইসরার আহমেদ (রহ.), শায়খ আবদুস সামি বিশেষভাবে উলেখযোগ্য।

কুর'আনের গভীর তাৎপর্য সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন Bayyinah Institute।

তাঁর রচিত গ্রন্থের মাঝে রয়েছেঃ

- Divine Speech: Exploring Quran As Literature
- Arabic With Husna
- Revive Your Heart

নবী নূহের (আ.) করা দু'আর শিক্ষা নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে উস্তাদ নোমান আলী খান বলেন:

"আল্লাহ আমাদেরকে জ্ঞান দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের মন যা চায়, আমরা তা করতে চাই, এ ব্যাপারে কুর'আন কি বলে তা আমাদের জানার দরকার নেই কিংবা আমরা তার তোয়াক্কা করি না। আমাদের ইচ্ছা ও অনুভূতি যা বলে, আমরা যদি সেটাই করতে নেমে পড়ি, তবে ধরে নিতে হবে যে আমাদের কামনা ও বাসনা আমাদের ওপর চেপে বসেছে। এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে বুঝতে হবে যে, আমরা এই নূহের (আ.) এই দু'আ থেকে কিছুই শিখছি না।"

এই বইটিতে নবী ও রাসূলদের করা বিভিন্ন দু'আর এরূপ বহু গূঢ় তাৎপর্য আলোচিত হয়েছে, তুলে ধরা হয়েছে সেসব দু'আর সাথে জড়িত প্রেক্ষাপট, পটভূমি ও শিক্ষা, যা কুর'আনের মর্ম আরও গভীরভাবে উপলব্ধির জন্য বিশেষভাবে সহায়ক।

আশা করি সম্মানিত পাঠকগণ এই বইটি থেকে উপকৃত হবেন এবং এর মাধ্যমে তারা কুর'আন উপলব্ধির প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হবেন। ইনশাআলাহ।